মনসুর আজিজ

ভেলায় চড়ে সারাবেলা

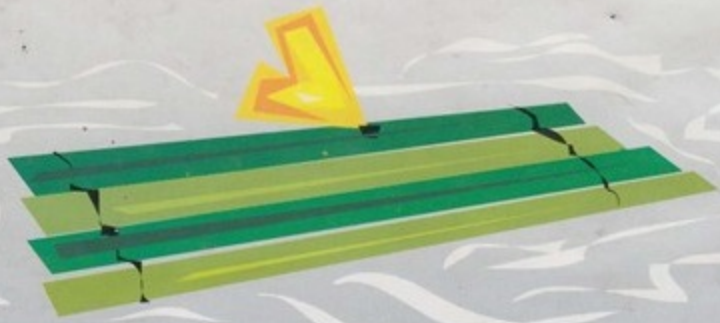

ভেলায় চড়ে সারাবেলা

মনসুর আজিজ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

www.amarboi.org

ভেলায় চড়ে সারা বেলা

মনসুর আজিজ

প্রকাশক
এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোনঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
একুশে বই মেলা ২০০৮

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০,
ফোন ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ
মুবাশ্বির মজুমদার

অংকন
খলিল রহমান

ডিজাইন
ডিজাইন বাজার
৪৮ এবি পুরানা পল্টন, বাইতুল খায়ের টাওয়ার
ঢাকা-১০০০, ফোন-৭১৭১৯৭৫

মূল্য ঃ ১৩৫.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫২, গভ: নিউমার্কেট, আজিমপুর,ঢাকা
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

VELAY CHARE SARABELA Written by Mansur Aziz, Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Limited, 125, Motijheel C/A, Dhaka. Price: TK. 135.00, US$. 5.00

ISBN-984-493-110-X

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

নব্বই দশকে সাহিত্যচর্চায় এসে যারা ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন মনসুর আজিজ তাদের মধ্যে অন্যতম। দেশের প্রধান প্রধান দৈনিক, সাহিত্যপত্রিকা ও সাময়িকীসহ শিশুকিশোর পত্রিকাগুলোতে তিনি নিয়মিত লিখে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। লিখছেন কবিতা, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উপন্যাস। মনসুর আজিজ মূলতঃ কবি। লিখছেন প্রায় দুই দশক ধরে। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও লিখছেন সমানভাবে। তাঁর লেখার ঢঙ অন্যদের চাইতে আলাদা। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায়ও রয়েছে নতুনত্ব। 'ভেলায় চড়ে সারাবেলা' তাঁর একটি কিশোর উপন্যাস। ছোটো ছোটো বাক্য আর চমৎকার দৃশ্যকল্প নির্মাণের মাধ্যমে তিনি পাঠককে টেনে নিয়ে যান সামনের দিকে। তিনি শিশুকিশোরদের বলতে চেয়েছেন স্বপ্ন ও বাস্তবতার কথা, সম্ভাবনার কথা। আমাদের শিশুকিশোররা যে কোনো বাঁধা পেরিয়ে জয়ের নিশান উড়াতে পারে। মনসুর আজিজ আমাদের সে গল্পই বলেছেন 'ভেলায় চড়ে সারাবেলা'য়। সম্পূর্ণ বন্যার পটভূমিতে রচিত এই কিশোর উপন্যাসটিতে তিনি দেখিয়েছেন জাবির তার বন্ধুদের সাথে নিয়ে কিভাবে মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। রিলিফ ক্যাম্পে মেম্বারদের নানা বাঁধা বিপত্তি ডিঙিয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে বন্যার্তদের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে জাবিররা কিভাবে ভূমিকা পালন করেছে- তার গল্প এঁকেছেন সাবলীলভাবে। বন্ধের দিনগুলোকে ডলি আপু, নিপু আপুরা কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন তার কথা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। মা-বাবার ভালোবাসা, দাদুর সাহচর্য, শিক্ষকদের উপদেশ আর বন্ধুদের সাথে নিবিড় বন্ধন, প্রতিবেশীর সাথে মধুর সম্পর্কের মাধ্যমে কিভাবে একটি চমৎকার সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় তা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে 'ভেলায় চড়ে সারাবেলা'য়।

শৈশব থেকেই মেঘনার ভাঙন দেখেছেন মনসুর আজিজ। দেখেছেন বন্যা, নদী পাড়ের মানুষের জীবনচিত্র, মেঘনায় ঘরবাড়ি বিলীন হয়ে যাওয়া, বানভাসী মানুষেরা কিভাবে লড়াকুর মতো বেঁচে থাকে। আর তাই 'ভেলায় চড়ে সারাবেলা' অত্যন্ত হৃদয় ঘনিষ্ট, গল্প হয়েও যেন অনেক বেশি বাস্তব।

'ভেলায় চড়ে সারাবেলা' শিশুকিশোরদের আনন্দ দেয়ার পাশাপাশি বড়োদেরও আনন্দ দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এখানে গল্পের মাধ্যমে আনন্দলাভের পাশাপাশি আমাদের কোমলমতি শিশুকিশোরদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে অনেক। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ প্রকাশিত 'ভেলায় চড়ে সারাবেলা' বিপুল পাঠকপ্রিয়তার মাধ্যমে সবার মন জয় করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(এস,এম, রইসউদ্দীন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

কথাশিল্পী

জুবাইদা গুলশান আরা

শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.amarboi.org

www.amarboi.org

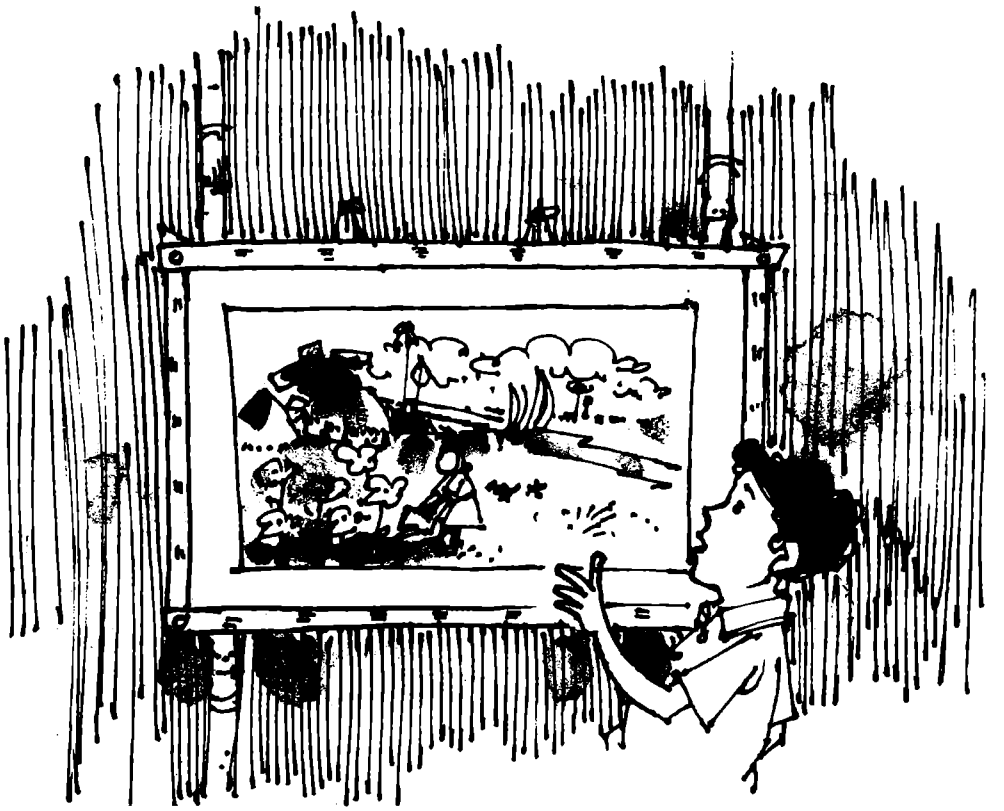

এক

মুলিবাঁশের বেড়ার সাথে টাঙানো একটা ছবি। জাবিরের আঁকা। ঝাড় থেকে একটা বাঁশ কেটে এনেছিলো সে। তারপর দা দিয়ে সুন্দর করে কয়েকটা চটা করেছিলো। ছবিটার মাপ নিয়ে চটাগুলো মনের মতো করে কেটে নিয়েছে জাবির। সেইসাথে ছবিটার মাপের একটা ফ্রেম। বাজার থেকে কিনে এনেছিলো গ্লাস পেপার আর পিন। তারপর একটা ছুটির দিনে ছবিটা বাঁধাই করেছিলো জাবির। বাবাকে টের পেতে দেয়নি। তাহলে আর রক্ষা ছিলো না। যা রাগী মানুষ! জাবির তার টেবিলের সামনের বেড়াটার সাথে টাঙিয়ে দিয়েছে ছবিটা। একটা আত্মতৃপ্তি তার মনে। মিনু খালা গত শীতে ঢাকা থেকে এসে কী না প্রশংসা করেছিলো ছবিটার। কয়েকটা তুলিও খালা কিনে দিয়েছিলো জাবিরকে। ফাহিম একদিন চুরি করেছিলো ছবিটা। কিন্তু ধরা পড়ে যায় দুদিনের মাথায়। বন্ধু বলে কিছুই বলেনি জাবির।

www.amarboi.org

জাবির এখন ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। সে যখন খুব বিমর্ষ থাকে, তখন ছবিটাকে বেড়া থেকে নামিয়ে আনে টেবিলে। এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দেখে নেয় ছবিটার প্রত্যেকটি পার্ট।
একটি সুন্দর গ্রাম। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট একটা খাল। খালে কয়েকটি নৌকা। পাল তোলা। ছোট ছেলে-মেয়েরা পানিতে খেলছে। একটি সুন্দর বাড়ি খালটির পুব পাড়ে। দুটি ঘর। সুন্দর সাজানো উঠোন। সামনে একটি ফুলের বাগান। আট বছরের একটি মেয়ে পানি দিচ্ছে ফুল গাছে। উঠোনে হাঁস-মুরগী আদার খাচ্ছে। খোলা আকাশ। সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। এক ঝাঁক পাখি উড়ছে। ...
কী চমৎকার!
জাবির ভাবতেও পারেনি সে এত সুন্দর ছবিটা এঁকেছে।
ইস্কুলের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ফাস্ট হয়েছিলো জাবির। হেডস্যার ও শিক্ষা অফিসার হ্যান্ডসেক করেছিলেন তার সাথে। পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করেছিলেন। সবাই জাবিরের দিকে হাসিমুখে চেয়েছিলো তখন। গর্বে তার বুকটা ফুলে উঠেছিলো সেদিন।

পাশের ঘর থেকে মা ডাকছেন–
জাবির, বাবা... একটু এদিকে আয়। ধানের বস্তাগুলো চকির উপর তুলতে হবে। ঘরের পিড়ায় পানি এসে গেছে। মেঝেতে চুঁইয়ে পানি উঠছে। জাবির, বাবা...
জাবির এখনো নিবিষ্ট মনে ছবিটা দেখছে। টেবিলের পায়া বেয়ে পিঁপড়ের দল উপরে উঠছে। কারের উপর ইঁদুর আর চিকার দাপাদাপি। বিড়ালটা টেবিলের নিচে বসে আছে, জাবিরের পায়ের কাছে।

মা আবার ডাকছেন–
জাবির, কোথায় তুই। মাকে একটু সাহায্য কর।
জাবিরের কানে মায়ের গলা ফাটানো চিৎকার পৌঁছোয়নি এখনো। যেন সুফি সাধকের মতো ধ্যান-যজ্ঞ করছে সে। বিড়ালটা টেবিলের নিচ থেকে পা-দানিতে উঠে বসেছে। জাবিরের সে দিকে খেয়াল নেই।

কদিন স্কুল বন্ধ। বন্যার্তরা আশ্রয় নিয়েছে স্কুলে। বন্ধুদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। বিড়ালটাই এখন তার বন্ধু। বিড়ালটা জাবিরের পা দুটো অনবরত চেটে যাচ্ছে। জাবির প্রথমটায় টের পায়নি। এবার আলতোভাবে জাবিরের পায়ে একটা কামড় দিলো বিড়ালটা। সদ্য ঘুম থেকে জেগে ওঠা শিশুর মতো চেতন ফিরে পেলো জাবির। নিচে তাকাতেই আৎকে ওঠে সে। পা-দানিটা পানি ছুঁই ছুঁই করছে। এবার মায়ের ডাকও কানে গেলো তার। ছবিটা টেবিলে রেখে তাড়াতাড়ি চলে গেলো ওঘরে। ঘরের মেঝে পানিতে টইটম্বুর। জাবির হেঁটে যাবার সময় চপর চপর আওয়াজ হচ্ছে। লুঙ্গিটা হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়েছে সে। অথচ একটু আগেও উঠোনটা শুকনো শুকনো ছিলো। মা ধানের বস্তাটা নিয়ে টানাহেঁচড়া করছেন। বস্তার তলাটা আধা হাত ভিজে গেছে। দুটো ইটের উপর ঘরের এক কোণে ছিলো বস্তাটা। মা-ছেলে ধরাধরি করে কোনো রকমে চকির উপর উঠালো ধানের বস্তাটাকে। এর সাথে দরকারি জিনিসপত্রগুলোও তুললো দুজনে। বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে।

www.amarboi.org

বাবা ভিজে চুবচুবে অবস্থায় ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই চকিতে বসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।
জাবিরের মা আমার সব শেষ হয়ে গেছে।
কি হয়েছে তুমি এমন করে কাঁদছো কেন? খুলে বলো সবকিছু।
আমার সব ফসল বন্যায় ভেসে গেছে। নদীর পাড়ের জমির ফসল সব শেষ।
অর্ধেকটা ভেঙ্গে নিয়ে গেছে মেঘনা। হায় আল্লাহ! এবার আমি কি খেয়ে বাঁচবো?
জাবিরের বাবা আবার কান্নায় ভেঙে পড়েন। সারাদিন পেটে কোনো দানাপানি পড়েনি। মা একটু শক্ত হলেন। আঁচলে চোখ মুছে স্বামীকে সান্তনা দিতে গিয়ে নিজের চাপা কান্না আর ধরে রাখতে পারেন না। চোখ মুছে বলেন–
হাত মুখ ধুয়ে আসো। কটা খেয়ে নাও। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।
এরপর দোকানের খবর জানতে চান মা।
বাবা বললেন–
দোকানের মালামাল সব তাকের উপর তুলে রেখে এসেছি।
বন্যার খবর কি আব্বা? পানি কতোটুকু বাড়বে?
পানির উপর দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করে জাবির। মুখটা মলিন করে বাবার উত্তরের অপেক্ষা করে সে।
আজ এক ফুট বাড়ার কথা আমাদের এদিকে। মনে হয় আরো বেশি বাড়তে পারে।
পানিতো খুব দ্রুত বাড়ছে। মা বললেন।
কি আর করা যাবে, দেখি আর কটা দিন। তোমাদেরকে জাবিরের নানার বাড়ি রেখে আসবো ভাবছি।
না না আমরা বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবো না।
জাবিরের ছোটো বোন ফারহানা বললো।
এর মধ্যে ওঘর থেকে পানি ভেঙ্গে বিড়ালটা এসে বসলো জাবিরের পাশে। জাবির কটা ভাত তুলে দিলো বিড়ালের জন্য রাখা প্লেটে।
সারাদিন না খাওয়া সবাই। মা চেয়েছিলেন বাবা আসলে একসাথে খাবেন। কিন্তু বাবা খেতে পারছেন না কিছুই।

জাবিরের বাবার একটা মুদি দোকান আছে বাজারে। জমির ফসল দিয়ে ভালোভাবেই তাদের বছর চলে যায়। আর দোকানের আয় দিয়ে সচ্ছলভাবেই জাবিরদের সংসার চলে। বন্যার অবস্থাটা হঠাৎ নতুন করে মোড় নেয়াতে জাবিরের বাবার চিন্তাটা বেড়েছে বেশি। দোকানের মালামালগুলো উপরের তাকে রেখে আসলেও চিন্তার ভাঁজ তার কপালে। দোকানের কর্মচারি আতাউর ছেলেটা মোটামুটি ভালোই বুদ্ধি রাখে। তার উপর হিসাব-নিকাশেও পাকা। ওর উপর ভরসা করে আকবর সর্দার তার জায়গা জমি ভালোভাবেই তদারক করতে পারেন। সেই সাথে বিকেলে আড্ডা দেয়া, বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোসহ সমাজের সালিশ বিচারে তার মোটামুটি একটা সুনাম আছে। কিন্তু সালিশ বিচারে তিনি কারো কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা নেন না। কেউ সেধে কিছু দিতে আসলে সর্দার সাহেব সেই সালিশে কখনোই উপস্থিত হবেন না। খুবই নীতিবান লোক আকবর সর্দার। ক্ষেতের ফসল দিয়ে তার খাদ্যের সংস্থান হয় আর দোকানের আয় দিয়ে চলেন স্বাচ্ছন্দ্যে। এটাই তার জীবন।

www.amarboi.org

ভাতের লোকমা মুখের কাছে নেয়ার সাথে সাথে ক্ষেতের কচি কচি ধানের গুচ্ছগুলোর কথা মনে পড়ে যায় তার। ধান ক্ষেতের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভাতের লোকমাটি আর মুখে ওঠে না। নামিয়ে আনেন ভাতের থালায়।

বা হাতের উল্টো পিঠে চোখের পানি মুছে নেন কাউকে না দেখিয়ে। কিন্তু মায়ের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন না কিছুতেই।

মা তাড়া দেন–

কি হলো! তুমি খাচ্ছো না কেন?

অশ্রু ভেজা চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আবার ভাত মাখতে থাকেন বাবা। জাবির আর ফারহানা এরমধ্যেই খেয়ে উঠে গেছে।

অসময়ে সময় খুবই দ্রুত বয়ে যায়। জাবিরদের ঘরেও আজ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তাড়াতাড়ি। চারদিকে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। উঠোন জুড়ে হাঁস-মুরগীর দাপাদাপি নেই। বাদুরের ডানা ঝাপটানো আর হুতুমপেঁচার ভয়াল ডাক ভেসে আসছে কলাগাছের ঝাড় থেকে। অমাবস্যার তিথি বলে জোনাকির আলো নেই। আকাশ ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে আছে। মেঘলা আকাশে দুএকটা তারা মিটিমিটি অস্পষ্ট জ্বলছে। বিজলির আলোতে মাঝে মাঝে প্রকৃতিটা আলোকিত হয়ে উঠছে। জাবির জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ফারহানা জাবিরের সাথে গল্প করে কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। জাবিরের চোখে ঘুম নেই। হারিকেনের আলোটা ডিম করে রাখা আছে। বাবা বোধ হয় ঘুমোননি এখনো।

বাইরে এখন মুষল বৃষ্টি। কোনো বাতাস নেই। একটানা ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চালে বৃষ্টির বাজনা কান্নার মতো শোনাচ্ছে জাবিরের কাছে। জাবির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে ঘুমের রাজ্যে চলে যায়। বৃষ্টি আর বন্যার পানি খাটের পায়া বেয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকে।

মাঝরাতে জাবিরের ঘুম ভেঙ্গে যায় হঠাৎ করে। সবাই এক খাটে ঘুমিয়েছিলো আজ। পানি খাট ছুঁই ছুঁই করছে। জাবির হারিকেনের সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিলো। হারিকেনটা বাড়িয়েই 'মা' বলে এক চিৎকার দিয়ে দুই হাত পিছিয়ে আসলো সে। ভয়ে তার শরীর কাঁপছে। মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছে না। মা ধরফর করে বিছানায় উঠে বসলেন। চোখ কচলিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কি হয়েছে বাবা! তুই কাঁপছিস কেন?

জাবির কথা বলতে পারছে না, শুধু ইশারায় খাটের দক্ষিণ কোণাটা দেখাচ্ছে।

মা সেদিকে তাকিয়ে আৎকে উঠলেন। জাবিরের বাবাকে জাগালেন।

এই ওঠো, সাপ। একটা দাঁড়াশ ফণা তুলে আছে। জাবিরের বাবা জেগে তাকালেন সাপটির দিকে। কোনো উত্তেজনা নেই সাপটির। নিজেও অসহায়। জ্বলজ্বলে চোখ দুটোতে বাঁচার আকুতি। একটু আশ্রয়ের সন্ধানই করছিলো এটি। ফণা তুলে থাকলেও আক্রমণ করার বাসনা তার মনে নেই । মাথাটা ডানে বায়ে নাড়িয়ে যেন বলছে– আমার কোনো অপরাধ নেই। শুধু একটু আশ্রয় চাই। অন্য সময় হলে ফোঁস ফোঁস করে গোটা চারেক ঠোঁকর মেরে চিরনিদ্রায় পাঠিয়ে দিতো চার জনকে।

www.amarboi.org

আজ সে নিরুপায়। মনে তার বেঁচে থাকার আকুতি। আকবর সর্দার আর দেরি করা ঠিক মনে করলেন না। পাকা বাঁশের লাঠিটাকে তুলে নিলেন ঘরের উত্তর কোণ থেকে। সাপটি অসহায়ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখছে। কারো ক্ষতি করার ইচ্ছে ওর মনে নেই। আকবর সর্দার কতক্ষণ চেয়ে রইলেন সাপটির দিকে। শত্রুকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। সাপটির কোমর বরাবর আঘাত করতেই সেটা কাবু হয়ে গেলো। এ ধরনের সাপের কোমর ভাঙার অভিজ্ঞতা তার আগে থেকেই ছিলো। সাপটাকে আরো কয়েকটা আঘাত করলেন তিনি। এরপর লাঠিটির মাথায় সাপটিকে তুলে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলেন। স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগলো সাপটির মরাদেহ।

এতক্ষণ সাপের আতঙ্কে কেউই পানির দিকে নজর দিতে পারেনি। কিন্তু ফারহানা হৈচৈ শুনে জেগেই বললো–

মা বিছানা পানিতে ভিজে যাচ্ছে।

একি, তাইতো!

মা বিছানাপত্র কোনো রকমে গুটিয়ে রাখলেন টেবিলের উপর। তারপর পাশের ঘরে চলে গেলো সবাই। সেখানে ধান চাল ও খাদ্যসামগ্রী ছিলো।

চকির উপর চার আঙুল পানি। ধান চালের বস্তাগুলো নিচের দিকে ভিজে উঠছে। কয়েকটা জলচৌকি ও পিঁড়ি পাশাপাশি বিছিয়ে তার উপর চালের বস্তাগুলো তিন জনে ধরাধরি করে উঠিয়ে নিলো। ফারহানা যতদূর সম্ভব হারিকেনটা উঁচু করে ধরে রাখলো। যাতে সবাই ভালোভাবে কাজ করতে পারে। এতটুকুন ফারহানার দায়িত্ববোধ দেখে মা একটু মিষ্টি করে হাসলেন।

জাবির এর মধ্যে এক ফাঁকে তার ছবিটা সরিয়ে এনে রাখলো একটা মাচায়। তারপর সরিয়ে আনলো তার রঙতুলি আর বই খাতাগুলো। বাবা মা মিলে ভাঙাচোরা কয়েকটি ইট দিয়ে খাটটাকে একটু উঁচু করে নিলেন।

ইশ...! জাবির বিস্ময় প্রকাশ করলো।

মা তোমার ডান পায়ে একটা জোঁক।

মা কোনো উত্তর করলেন না। চোখ দুটো নামিয়ে আনলেন পায়ের কাছে। পা দুটো মরা মাছের মতো সাদা। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ঘা হয়ে গেছে। জাবির একটু চুন আর লবণ মিশিয়ে জোঁকের মাথায় লাগালো। অমনি জোঁকটি ধপ করে পড়লো চকিতে। চকির তক্তা রক্তে একাকার। রক্ত খেয়ে ঢাউস হয়ে ছিলো জোঁকটি। জাবির ধান কাটার কাচি দিয়ে সেটাকে দুটুকরো করে পানিতে ফেলে দিলো। আর ফিটকিরি দিয়ে মায়ের পায়ের আঙুলগুলো কয়েকবার ঘষে দিলো। মা কোনো বাধা দিলেন না। বাকি রাতটা খাটের উপর কোনো রকম বসে বসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কাটলো সবার।

www.amarboi.org

দুই

পরের দিন পানি দুই ফিট বেড়েছে। জাবির আর ফারহানা ঘুমাতো এক খাটে। ওদের খাটটি একটু ছোটো। সেই খাটটি আনা হলো জাবিরের মা-বাবার ঘরে। এ ঘরের খাটটির উপর বসানো হলো জাবিরদের ছোটো খাটটি। তবুও পানি ছুঁই ছুঁই করছে। মাত্র চার আঙুল বাকি। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। রান্না করার মতো কিছু নেই। শুধু ভাত রান্না করা যায়। সব লাকড়ি ভিজে গেছে। মা আগেই কারের উপর কয়েকটি ধনচের আঁটি তুলে রেখেছিলেন।

এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। ফারহানাটার কষ্ট হচ্ছে বেশি। ও সবেমাত্র আটএ পা দিলো। জাবির তার কলাগাছের ভেলায় চড়ে খালপাড়ে গিয়েছিলো। কলাগাছের ঝাড় থেকে কয়েকটি থোড় আর বীচিকলা পেড়ে এনেছে। কলাগুলো এখনো বাতি হয়নি। কয়েকটা কাঁচা তেতুল হলে বেশ জমতো। ফারহানা বীচিকলা আর কাঁচা তেতুলের ভর্তা খেতে বেশ পছন্দ করে।

জাবিরের কাছেই ফারহানার সব আবদার, সব দাবি দাওয়া। পাকা গাব, বেথুনের থোকা, কৎবেল– এমনকি দর্জির দোকান থেকে কাটা কাপড়ের টুকরাও এনে দিতে হয় ওর পুতুলের জন্য। নতুন নতুন কাপড়ের টুকরাগুলো দিয়ে ফারহানা তার কচি হাতে পুতুলের জন্য জামা বানিয়ে সেগুলো পরিয়ে দেয় পুতুলগুলোকে। তখন তার আনন্দ বেড়ে যায় কয়েকগুণ। হেনাদের সাথে পুতুল খেলার ধুম পড়ে যায় তখন।

www.amarboi.org

ফারহানা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে। থোড় আর কলার ভর্তা খেয়ে কতোক্ষণ আর থাকা যায়। ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকারে ছেয়ে আছে। মায়ের চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল হয়ে গেছে। বাঁশের চুঙ্গাটা দিয়ে অনবরত ফুঁ দিয়ে যাচ্ছেন মা। আগুনের শিখা বেশি বাড়ছে না। জাবির তার বইয়ের তাক থেকে পুরাতন খবরের কাগজ এনে দেয় মাকে।

চুলার ভিতর খবরের কাগজ গুঁজে দিতেই দাউ দাউ করে আগুনের শিখা বাড়তে থাকে। চুলা থেকে সাপের ফণার মতো আগুনের শিখা বাইরে চলে আসে। পাতিলের বাইরের অংশটাও গরম হয়ে ওঠে। জাবির ফেরার পথে বিল থেকে শাপলা তুলে এনেছিলো। শালুকের গোটাও ছিলো কোচর ভর্তি। আগুনের শিখায় ভাই-বোন শালুকের গোটাগুলো পুড়িয়ে খাচ্ছে।

মা তুমিও নাও একটা। বলে ফারহানা একটা শালুক এগিয়ে দেয় মায়ের দিকে।

মা না করতে পারেন না। না করলে ওরাও খাওয়া বন্ধ করে দেবে– এটা মা ভালো করেই জানেন।

শালুক খাওয়া শেষ করে ফারহানা শাপলার ডাঁটাগুলোর আঁশ ছাড়াতে থাকে।

আজ আর অন্তত ফেনভাত খাওয়া লাগবে না। শাপলা ভাজি দিয়ে খাওয়া যাবে।

এ জন্য ফারহানার খুশির অন্ত নেই।

জাবিরের কাজের কোনো শেষ নেই। যেই শাপলা ভাজির আয়োজন হলো, অমনি মাথায় চিন্তা দানা বাঁধলো, সাথে দুটি খলসে পুঁটি হলে মন্দ কি?

যেই ভাবা সেই কাজ। বড়শি নিয়ে বের হয়েছে পশ্চিম দিকে। খালের পাড়ে ওদের ধনচেক্ষেত আর পাটক্ষেতের কাছে কয়েকটি মান্দারগাছ আছে। মান্দারগাছগুলো বেশ মোটা। লম্বাও কম নয়। পাটক্ষেত আর ধনচেক্ষেতের শুধু পাতাগুলো দেখা যায়। বিস্তির্ণ জলরাশির মধ্যে যেন একটুকরো সবুজ গালিচা। জাবির সেদিকে নিবিষ্ট মনে চেয়ে রইলো কতোক্ষণ। তার ভেলাটি স্রোতের টানে খালের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে ক্রমশঃ। সেদিকে তার খেয়াল নেই।

সামনে একটি ঘূর্ণাবত। তার থেকে মাত্র দশ হাত দূরে। এই ঘূর্ণিতে ঢুকে গেলে আর বাঁচার উপায় নেই। বারমুডা ট্রায়াঙ্গালের মতো অদৃশ্য হবার যোগাড়।

হঠাৎ উত্তর দিক থেকে ফাহিম চেচিয়ে উঠলো–

জাবির তোর ভেলা খালে ঢুকে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সামলে নে। ঐ পাশে ঘূর্ণিতে পড়ে গেলে আর রক্ষা পাবি না।

ফাহিমের ডাক শুনে ওর চেতন ফিরে আশে। তাড়াতাড়ি পাকা বাঁশের লগিটাকে ডান পাশে ঘুরিয়ে আনে। সর্বশক্তি দিয়ে লগি মারে ডানপাশে। লগিটা স্রোতের প্রতিকূলে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যায়। জাবিরের দুবাহুর রগগুলো জেগে ওঠে। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে গোটা দেহ। ঘুর্ণিতে পড়ে গেলে বাঁচার উপায় নেই। লগিটা মাটিতে গেড়েই আস্তে আস্তে তার ভেলাটিকে কিনারে চাপাতে চেষ্টা করে জাবির। মান্দারগাছটা তিন গজ দূরে। ভেলাটা এখন স্থির আছে। ফাহিম লগি মেরে তার ভেলাটা মান্দারগাছের সাথে বাঁধলো দ্রুত। এরপর তার ভেলার দড়িটা ছুঁড়ে দিলো জাবিরের দিকে। জাবির দড়িটা শক্ত করে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগলো মান্দারগাছের দিকে। হাত দুটো লাল টকটকে হয়ে গেছে। হাতের তালুর চামড়া উঠে গেছে কয়েক জায়গায়।

দোস্ত তুই আজ আমাকে বাঁচালি।

www.amarboi.org

সব সময় শিল্পীগিরি দেখালে এমনই হয়। বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সব আর পানির উপর তুই দেখছিস সবুজ গালিচা। যত্তসব!
ফাহিমের কথায় বন্ধুর প্রতি ক্ষোভ ঝরে পড়ছে।

এইরে সেরেছে। তোর হাত থেকে যে রক্ত পড়ছে! দেখি দেখি!
জাবিরের হাত দুটো টেনে নেয় ফাহিম।
ইস! কী অবস্থা হয়েছে হাতের! এখন কি করা যায়?
ফাহিম এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। এমন সময় খুব কাছ দিয়েই একটা কচুরিপানা ভেসে যেতে দেখলো। তার মাঝখানে একটা কচুগাছ। হাতের লগিটা বাড়িয়ে দিলো কচুগাছটির দিকে। আস্তে আস্তে মান্দারগাছটির কাছে ভিড়লো সেটি। কচুগাছের একটা ডাঁটা ছিঁড়ে সেটার রস লাগিয়ে দিলো জাবিরের হাতের তালুতে। জাবির কয়েকবার উহ্! আহ্! করেছে মাত্র।
রক্ত ঝরা আপাতত নেই। ব্যথাও কমেছে কিছুটা। ওরা বসে আছে মান্দারগাছের উপর তাদের বানানো মাচায়। এটা কদিন আগে ওরা বানিয়েছিলো। আগের মাচাটা ছিলো ধনচে ক্ষেতের পাশে। সেটা এখন তিন হাত পানির নিচে। পানি বাড়ার সাথে সাথে ওরাও ওদের চৌকি পরিবর্তন করেছে। মান্দারগাছের মাচাটি বানাতে গিয়ে ওদের মান্দারকাঁটার ঘা খেতে হয়েছে। পরে দা দিয়ে বাকল থেকে কাঁটাগুলো ছেটে ফেলেছে ওরা। আর রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য মাথার উপর দিয়েছে কলাপাতার চান্দিনা। ওপাড়ার মফিজরা ওদের মাচাটি দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। জাবিররা ঈর্ষাপরায়ণতাকে থোড়াই কেয়ার করে।

কদিন আগে মফিজরা এসেছিলো ওদের মাচাটি গুঁড়িয়ে দেবার জন্য। সে সময় পানি কম ছিলো। ওদের দেখেই জাবির আর ফাহিম লুকিয়েছিলো ধনচে ক্ষেতে। যেই না ওরা মাচার কাছে এসেছে, অমনি ধররে বলে লগিটাতে সর্বশক্তি দিয়ে দিলো এক ঘা, ভেলাটা দ্রুত চলে আসলো মান্দারগাছটির কাছে। হাতের লগিটা আগেই মাথার উপর নিয়ে রেখেছিলো জাবির। ফাহিমের হাতেও ছিলো বাঁশের একটা কঞ্চি। মফিজের কোমরে কায়দা করে একটা বাড়ি মারতেই ও পড়ে গেলো পানিতে। আর পায় কে তাকে। ফাহিম বাড়ি দেবার আগেই মদন শেখের পোলা কালু ঝাঁপ দিলো পানিতে। ওরা দুজন স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটছে। আর জবিররা তখন মাচায় বসে মজা করে শালুক খাচ্ছে।
দোস্ত চল আজ আর মাছ ধরে কাজ নেই। তোর হাতের অবস্থা যা–
জাবির বললো–
না কয়েকটা পুঁটি হলেও ধরে নিয়ে যেতে হবে। ফারহানা খালি ভাত খেতে পারে না। দুটো পুঁটি হলেও ভেজে দিতে পারবেন মা।
ঠিক আছে তোর যা খুশি।
বলেই দুজনে আদার গাঁথতে লাগলো বড়শিতে।

আজ ভালো মাছ পেলো ওরা। খলসে-পুঁটি-টেংরা– ডুলাটি ভরে গেছে মাছে।
মাচা ছেড়ে দুজনেই বাড়ির পথ ধরলো। কিছুদূর যাওয়ার পর দুটি ভেলা চলে যাচ্ছে দুদিকে। বিকেলের সোনারোদ বিলের পানিকে ঝলমলিয়ে তোলছে। দুবন্ধু হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ভেলা ছোটালো যার যার বাড়ির দিকে।

www.amarboi.org

তিন

ফারহানার প্রচন্ড জ্বর। জ্বরে সে আবোলতাবোল বকছে। সেই সাথে খুকুর খুকুর কাশি। মা মাথার কাছে বসে পানি ঢালছেন তার মাথায়। বানের পানি। কতো মানুয়ের কতো ময়লা, আবর্জনা, কতো মজা পুকুরের পানি, গরু-ছাগল-মানুষের বিষ্ঠা– সব একাকার এ পানিতে। সে পানিই মা ঢালছেন ফারহানার মাথায়। ফুটফুটে চেহারাটা দুদিনেই মলিন হয়ে গেছে। ঘরে একফোঁটা খাবার পানি নেই। জাবিরদের পানির কলটি এখন তিন ফুট পানির নিচে। পানি আনতে হলে বেড়িবাঁধের ওপারে যেতে হবে। সেখানে মানুষের মাথা মানুষে খায়। লোকে লোকারণ্য বেড়িবাঁধের পুর পাড়ে। পা ফেলার জায়গা নেই কোথাও। মনে হয় কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে। সবাই কিয়ামতের ময়দানে

www.amarboi.org

হাজির হয়েছে আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতে।
বেড়িরাস্তায় রিক্সা চলাতো দূরের কথা মানুষও চলাচল করতে পারছে না। বানভাসিরা গরু-ছাগল আর মহিষ খুটা গেড়ে রেখেছে বেড়িরাস্তায় ঠনা মাটিতে। তার সাথে হাঁস-মুরগীর খোয়াড়।

ভেলা নিয়ে যেতে আসতে এক ঘন্টা করে দুই ঘন্টা লাগবে পানি আনতে। আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। একজন সঙ্গী হলে ভালো হতো। জাবির সিলভারের কলসিটা মায়ের কাছ থেকে নিলো। ফারহানা পানি পানি করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর মুখটা এখন মরা ইলিশের মতো সাদা। মনে হয় গায়ে কোনো রক্ত নেই। দুফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লো জাবিরের চোখ থেকে। এরপর বাঁশের লগিটা হাতে নিলো সে। লগিতে খোঁচা মেরে এগিয়ে যেতে লাগলো বেড়িবাঁধের দিকে। মাঝে মাঝে লগি দেবে যেতে চায় কাদামাটিতে। কতো দিন ধরে মাটির চেহারা দেখে না জাবির; ভাবতে থাকে। হিসাব মেলাতে পারে না।
উত্তর পশ্চিম কোণে কালো মেঘ আকাশ ঢেকে আসছে। জাবিরের মাথার উপর প্রথম বিকেলের সূর্যের আলো। ভেলাটা সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। বাতাসে ছোটো ছোটো ঢেউ খেলা করছে বিলের পানিতে। জাবির লগিতে কচি ধানগাছের স্পর্শ অনুভব করছে। গত বছর এমন দিনে তারা এখানে দল বেঁধে ঘুড়ি উড়িয়েছিলো। দখিনা বাতাসে ধানক্ষেতে মধুর বাজনার সৃষ্টি হতো তখন। বিকেলবেলা দিগন্তজোড়া-সবুজ মাঠে তাকিয়ে থাকতো জাবির। পাশে ফাহিম এসে বসতো। পুরা ভর্তি চালভাজা, শিমের বীচি আর কলাই ভাজা নিয়ে দৌড়ে আসতো ফারহানা। সবাই গোল হয়ে বসে গল্প করতো। আসরের নামাজ পড়ে দাদি তসবি জপতেন অনেকক্ষণ। তারপর জাবিরদের আড্ডায় এসে যোগ দিতেন। দাদি যতক্ষণ থাকতেন সবাইকে হাসিয়ে পেটের চামড়া ব্যথা করে ছাড়তেন। দাদিও হাসতেন। হাসলে তাকে আরো অনেক সুন্দর লাগতো। দখিনা বাতাস দাদির মেহেদিরাঙা সোনালি চুলগুলো এলোমেলো করে দিতো। ফারহানা চেলি বেঁধে দেয়ার চেষ্টা করতো দাদির চুলে। দাদি বাধা দিতেন।
খোপা বেঁধে দে। আমার কি চেলি বাঁধার বয়স আছে?

আবার দাদি তার গল্পে ফিরে আসতেন।
জাবিরের কোন হুঁশ নেই। সে স্মৃতিসাগরে সাঁতার কাটছে আর আনমনে লগিতে খোঁচা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে একটা মুরগী ভেসে যেতে দেখে তার হুঁশ হলো। সে আৎকে উঠলো ।
এটা যে ফারহানার লাল মুরগীটা! গতকালের পর থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। জাবির ডান দিকে বড়ো করে লগিতে খোঁচা দিয়ে বামদিকে এগিয়ে গেলো। মুরগীটাকে তুলে আনলো ভেলার উপর। এখনো দম আছে মুরগীটার। পেটে কোনো খাবার নেই।
জাবিরের শার্টের পকেটে চালভাজা ছিলো। সেই সাথে কয়েকটা শিমের বীচিও। চালভাজা খাওয়া জাবিরের শখ। সে কয়েকটা চালভাজা মুরগীটার ঠোঁটে ঢুকিয়ে দিলো। কিন্তু মুরগীটা গিলতে পারছে না। মুরগীটা যে চালভাজা গিলতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, জাবির তা বুঝতে পারছে। সে আরো কয়েকটা চালভাজা পকেট থেকে বের করলো। নিজের মুখে নিয়ে চিবিয়ে সেগুলো নরম করে মুরগীটার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো। দোলা আস্তে আস্তে চোখ খোললো। ফারহানা তার আদরের এই মুরগীটাকে দোলা বলে ডাকে। দোলা নিবিষ্ট মনে জাবিরের মুখের

www.amarboi.org

দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। চিবানো চালভাজাগুলো আস্তে আস্তে গিলতে চেষ্টা করলো। সেগুলো গিলতে পেরেছিলো কি না জাবির বুঝতে পারেনি। দোলার স্থির চোখ এবার শূন্য আকাশ ও বিস্তির্ণ জলরাশির চারপাশে ঘুরে আসতে লাগলো। একটু পর হঠাৎই চোখ দুটো বন্ধ করে দপ করে পড়ে গেলো মাথাটা। জাবিরের আর বুঝতে বাকি রইলো না কিছুই। দোলাকে বুকের মাঝে চেপে রইলো কিছুক্ষণ। চোখ থেকে গরম পানি বের হয়ে বানের পানির সাথে মিশে গেলো। চোখ মুছে জাবির মুরগীটার মৃত দেহের দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ফারহানার পান্ডুর মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বানের পানিতে মুরগীটার মরাদেহ ভাসিয়ে দিতে চাইছিলো জাবির। কিন্তু তার মন সায় দিলো না। বেড়িবাঁধে গিয়ে সে এটাকে কবর দিবে। ফারহানা যদি কখনো জানতে পারে, সে দোলাকে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে, তাহলে সে বড়ো আঘাত পাবে। ছোট্ট ফারহানাকে জাবির এ আঘাত দিতে পারে না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে জাবির আৎকে উঠলো। সূর্যটা অনেকখানি পশ্চিমে হেলে পড়েছে। লগিটা তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিলো। আবার সচল হয়ে উঠলো জাবিরের ভেলাখানি। দুবাহুর রগগুলো পাকানো দড়ির মতো জেগে উঠতে থাকে। এখনও অনেক পথ বাকি। বেলা ডোবার আগেই ফিরে আসতে হবে।

বেড়িবাঁধের কাছে আসলে জাবির ফাহিমকে দেখতে পায়।

তুই এত দেরি করলি কেন? আমি তোর জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।

জাবির কাদামাটিতে লগিটা গাড়তে গাড়তে সব কথা খুলে বললো। ফাহিম ভেলার উপর দোলার মৃতদেহটা দেখে দুঃখ প্রকাশ করলো। দোলাও তাদের একজন বন্ধুর মতোই ছিলো।

ওরা বিকেলে যখন গল্প করতো, দোলাও তখন ফারহানার কোলে বসে থাকতো। ফাহিম শার্টের হাতায় তার চোখ দুটি মুছে নিলো।

দোলাকে রাস্তার একপাশে কবর দিয়ে ওরা উপরে উঠে আসলো।

রাস্তার উপর মানুষ আর মানুষ। মানুষের মাথা মানুষে খায়। গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়ার ডাক আর শিশুদের চিৎকার; এর সাথে ক্ষুধার্ত মানুষের আহাজারি, মহিলাদের ঝগড়া, চুল ছিঁড়াছিঁড়ি– সবমিলে একটা ভয়ানক দৃশ্য। কলপাড়ে বানভাসি মানুষের দীর্ঘ লাইন। ওরাও লাইনে দাঁড়ানো। অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে অবশেষে কলসি ভরতে পারলো জাবির ও ফাহিম। এদিকে বেলা আর বেশি বাকি নেই। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে হবে। ফিরার পথে ডাক্তার চাচার দোকান থেকে ফারহানার জন্য ওষুধ কিনলো জাবির। এরপর দর্জির দোকান থেকে কয়েক টুকরা রঙিন কাপড় কুড়িয়ে নিলো। ফারহানা দেখলে দারুণ খুশি হবে। মোল্লার দোকান থেকে দুই টাকার মনেক্কা কিনে জাবির কলসিটাকে মাথায় নিলো। ছুটলো ভেলার দিকে। ফাহিম এর মধ্যেই দুটি ভেলার লগি উঠিয়ে বসে আছে জাবিরের অপেক্ষায়।

দেরি হয়ে যাচ্ছেতো। দে, কলসিটা আমার হাতে দে।

জাবির মাথাটা একটু নিচু করে আনলো। ফাহিম কলসিটা রাখলো জাবিরের ভেলার উপর।

দুজনে সমান তালে লগি মেরে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তর পশ্চিম কোণের মেঘখন্ডটা এখন আকাশে নেই। তবে তুলার মতো সাদা সাদা মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই মেঘ আকাশের সৌন্দর্য।

www.amarboi.org

একটু পর সূর্যের লাল আভায় এই মেঘগুলোকে আরো সুন্দর লাগবে। আগে সন্ধ্যাবেলা কলপাড়ে দাঁড়িয়ে জাবির আর ফারহানা প্রায়ই ঝগড়া করতো। ফারহানা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতো–
ঘোড়ার মতো লাল এই মেঘটা আমার ।
জাবির তখন গর্বের সাথে বলতো–
ঐ যে দেখ, নতুন চাঁদের দক্ষিণ পাশে, চাঁদটির একটু উপরে সপ্তডিঙা যে মেঘটা আছে না, ঐটা আমার। দেখ দেখ কী সুন্দর রঙিন পাল। তোর ঘোড়াটার চেয়ে কত্ত সুন্দর।
না, তোরটা সুন্দর না। ঐ দেখ আমার ঘোড়াটার কতো সুন্দর কেশর। মরুভূমির বালিতে কী সুন্দর করে আগাচ্ছে।
আর আমার সপ্তডিঙা দেখ, মনে হয় আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছে।
একটা কালো মেঘ ক্রমেই সপ্তডিঙাকে ঢেকে দিচ্ছে। মেঘখন্ডটি দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে ধেয়ে আসছে। ফারহানার লাল কেশরের ঘোড়াটি উত্তর দিক থেকে যখন সপ্তডিঙাকে ঢেকে দিচ্ছিলো, তখন আর তাকে পায় কে।
দুই হাতে জোড়ে তালি বাজাতে লাগলো।
ঐ দেখ তোর সপ্তডিঙা আটলান্টিকে তলিয়ে যাচ্ছে।
জাবির তার চুলের বেণীটাতে ছোট্ট একটা টান দিয়ে বলে–
তোরই জিত হয়েছে।

কিরে উদাস হয়ে কি ভাবছিস। ঐ দেখ মফিজ আর কালু মুন্সিবাড়ির বটগাছটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তাড়া করবি নাকি।
ফাহিম জিজ্ঞেস করে জাবিরকে।
জাবির মুন্সিবাড়ির দিকে তাকালো একবার। মুন্সিবাড়ির বড়ো বড়ো ঘরগুলোর শুধু টুয়া দেখা যায়। আর বাকিটা পানির তলে গা ডুবিয়ে দিয়েছে। বটগাছটার পাতাগুলো হলুদ হয়ে গেছে। জাবিরদের দেখতে পেয়েছে মফিজরা। মনে হয় ওরা ভয় পেয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি লগি মেরে ফারাকে যেতে চাইছে।
জাবির বললো–
নারে আমাদের মতো সবাই বিপদে আছে। এখন মারামারি কিংবা ঝগড়াঝাটি করার সময় না। আঁধার ঘনিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি চল। আরো তো বিশ মিনিট লাগবে।
ওরা লগিতে জোরে জোরে ভর দিতে লাগলো। মাগরিবের সময় পার হয়ে গেছে। চারপাশে রাতের পর্দা নেমে আসছে। পশ্চিম আকাশে উঁকি দিচ্ছে পাঁচ দিনের একটি কিশোর চাঁদ। জাবির আর ফাহিমের ভেলা দুটি দুদিকে চলে যাচ্ছে। আর তাদের একাকিত্ব ঘোচানোর জন্য সঙ্গী হয়েছে কিশোর চাঁদটি।

www.amarboi.org

চার

কদিন ধরে পানি থম ধরে আছে। বাতাসের ঝাপটাও কমে এসেছে। চারপাশে গ্রামের সারি সারি গাছপালাগুলো দেখে মনে হয় বৃক্ষবন্ধন করছে। পাটির মতো শান্ত পানিতে সবুজের রেখাগুলো স্পষ্ট। পানির উপরে টিনের চালাগুলো ভেসে আছে। দুপুরের রোদে সেগুলো ঝিকমিক করছে। জাবিরদের বসবাস এখন ঘরের চালে। শুধু জাবিরদের নয়, যাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই কিংবা ভিটা মাটির টানে যারা পড়ে আছে, তারা সবাই এখন ঘরের চালে আশ্রয় নিয়েছে। ঘরের চালা এখন আর ইলিশের দাঁড়ার মতন নেই। সব চালা সমতল করা হয়েছে। এই পানি অবরোধ কতো দিন চলবে তা আল্লাহ মাবুদ ভালো জানেন।

www.amarboi.org

সবারই খাবার প্রায় ফুড়িয়ে আসছে। তার চেয়ে বড়ো সমস্যা, শুকনো লাকড়ি এখন আর কারো মজুদে নেই।

বেড়িবাঁধের উপরে রিলিফ ক্যাম্প চালু হয়েছে। চেয়ারম্যান সাহেব নিজে তদারক করছেন ক্যাম্পটি। তিনি খুবই ভালো মানুষ। জাবিরের বাবার মামাতো ভাই। কিন্তু মেম্বাররা কোন তালে কতো চাল মারবে, সে ধান্ধায় ক্যাম্পে পড়ে আছে। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। জাবির সকালবেলাটা বেড়িবাঁধের কাছে কাটিয়ে দেয়। তার সাথে ফাহিমও থাকে। ওরা বন্যার্তদের মধ্যে স্লিপ পেপারগুলো সরবরাহ করে। আর রিলিফ নেয়ার সময় সেগুলো জমা নেয়। চেয়ারম্যান চাচা ওদেরকে খুব ভালো জানেন। কিন্তু মেম্বারদের চেলারা ওদের পাত্তা দিতে চায় না। চেয়ারম্যান চাচার সেক্রেটারিও না। ওরা জাবিরদের উপদ্রব মনে করে। গতকাল বিদায় নেয়ার সময় চেয়ারম্যান চাচা জাবিরদের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কেঁদে ফেলেছেন। চোখ মুছে বলেছেন–
তোমাদের মতো মায়ের সন্তানেরা যেদিন দেশ চালাবে, সেদিন আর দেশে কোনো অভাব থাকবে না। আল্লাহ তোমাদের অনেক বড়ো করুন।
চেয়ারম্যান চাচার কথা শুনে জাবিরের চোখেও পানি এসে যায়। মনের ভেতর ভাবনারা প্রশ্ন করে, আসলেই কি ওরা দেশের জন্য কিছু করছে? করছে মানুষের ভালোর জন্য কিছু? ওর ছোট্ট মনে কোনো উত্তর মেলে না, তবে নিরন্ন মানুষের না খাওয়া করুণ মুখগুলোতে এক কেজি রিলিফের চাল পাওয়ার পর, যে তৃপ্তি ও হাসি তাদের চোখে মুখে দেখেছে– তা যদি দেশের সেবা হয়, তবে ওরা দেশের জন্য, মানুষের জন্য কিছু করছে।

আজকে যারা এক কেজি চালের জন্য সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রিলিফ ক্যাম্পে অপেক্ষা করছে, তারা কখনও না খেয়ে থাকেনি। কয়েক ঘর বাস্তুহারা ছাড়া নীলকমল ইউনিয়নের প্রায় সবাই দুবেলা খেতে পায়। বেশির ভাগ মানুষ অশিক্ষিত হলেও শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও কম নয়। অনেকে সরকারের বড়ো বড়ো পদে চাকরিও করেন।

মেঘনা পাড়ের এই মানুষেরা কাঁচা টাকা কামাই করে মেঘনায়। ভরা বর্ষায় কাঁচা টাকার যোগান বেশি। সবার মনে তখন আনন্দের ঢেউ লাগে। নৌকা মেরামত করে তলায় আলকতরার প্রলেপ দিতে ব্যস্ত থাকে সবাই। আলকাতরা লাগানো খাড়া করা এই নৌকাগুলো রোদের ঝিলিকে চকমক করতে থাকে। বাড়ির মা ঝিয়েরা গাব কুটে দেয়। কোটা গাবগুলো পুরনো নৌকাতে ভিজানো হয় কয়েক দিন। জেলেরা পুরাতন জাল সেলাই করতে থাকে। মনের সুখে রেডিও বাজিয়ে শুনতে থাকে নানান রকম গান। মাথার উপর বাতাসে দোলখায় বাদামের সামিয়ানা। পাশেই মেঘনা নদীতে ঢেউ দেখে তাদের মনের ঢেউ চাউড় দিয়ে ওঠে। বিপুল উৎসাহে জাল সেলাই করতে থাকে তারা। দর্জি দোকানেও তখন নতুন বাদাম সেলাইয়ের ধুম পড়ে যায়। নানান ধরনের মার্কিন কাপড়ের গন্ধ নাকে লাগে। নৌকার হিসাব মতো মাঝিরা বাদামের অর্ডার দেয়। সৌখিন জেলেরা চায় রঙিন বাদাম। সেই সাথে রঙিন নিশান। যেন এক ঈদ ঈদ সাজ চারদিকে।
গাব পঁচে গেলে তার ভিতর জালগুলো চুবানো হয়। গাবের পানিতে কয়েক দিন রেখে আবার তা রোদে শুকানো হয়। এভাবে জালগুলো শক্ত ও মজবুত হয়। মজবুত হয় জেলেদের পেশীগুলো। মা

www.amarboi.org

ঝিয়েরা ঘরে বসে নতুন জাল সেলাই করে। যে সব মেয়েদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে, তারাও জাল সিলাই করতে বসে যায়। একটি জাল সেলাই করলে তারা দশ টাকা করে পায়। শখের বসে শিক্ষিত ঘরের মেয়েরাও এ কাজ করে। মনের আনন্দে জাল বোনে।

ফাল্গুন মাসে স্কুল বন্ধ থাকাতে জাল বুনতে তাদের কষ্ট হয় না। সেই সাথে হাতে দুটি পয়সাও আসে। নিজের রোজগার করা পয়সা। এটা দিয়ে মেয়েরা তাদের শখের জিনিস কিনতে পারে, বাবা মায়ের কাছে হাত পাততে হয় না। গাছের নিচে সবাই জড়ো হয়ে জাল সেলাই করতে থাকে। কদিন পর ওরাই আবার নতুন নূপুর পরে ঝুমুর ঝুমুর বাজনা বাজিয়ে পাড়া মাত করবে। জাবিরদের হেডস্যারের মেয়ে ডলি আপু, নিপু আপুরাও জাল সেলাই করে। ওরা এখন গার্লসে পড়ে। জাবির যখন ওদের বড়ো আমগাছের ডালে ডালে ফালগুনের দুপুরে ঘুরে ঘুরে আম খোঁজে; ডলি আপু, নিপু আপুরা তখন নিচে বসে জাল সেলাই করে। এর মধ্যেই ওদের হাত জেলেনির মতো পাকা হয়ে আসে। জাবির যখন গাছের পাতায় পাতায় আম খোঁজে তখন ডলি আপু, নিপু আপুরা কতোক্ষণ পরপর উপরের দিকে তাকিয়ে বলে –

জাবির, ভাইয়া..., একটা আম দে না!

জাবির ওদের ডাক শুনে জিহবা বের করে দেখিয়ে দেখিয়ে আম খায়।

শুধু একটা দে। নিপু আপুর করুণ আকুতি।

জাবির গাছ থেকে বলে–

আম দিতে পারবো না, শুধু বোড়াটা দিতে পারি।

তাই দে। জাবির বোড়াটা দিতো না, নিপু আপুর জন্য বড়ো সাইজের আমটা ছুঁড়ে দিয়ে বলতো–

আপু ক্যাচ ধরো তোমার জন্য আমের বোড়া পাঠালাম।

নিপু আপু বড়ো সাইজের আম পেয়ে ডগমগে গলায় বলতো–

জাবির ভাইয়া তুমি খু-উ-ব ভালো।

ভালো না ছাই। কালকে তোমার কাছে জলপাইয়ের আচার চাইলাম, তুমি ছোটো একটা জলপাই দিয়ে বললে–

আর নাই ভা-ই-য়া।

এরপর নিজে চার চারটা জলপাই খেলে।

এ কথা শোনার পর নিপু আপু আর কোনো কথা বলে না। মাথাটা নিচু করে মিটিমিটি হেসে জাল সেলাইয়ে মনোযোগ দেয়।

জাবির হেনার দিকেও একটা আম ছুঁড়ে দেয়। এরপর কোচর ভর্তি করে নেমে আসে নিচে।

সবাই জটলা পাকিয়ে আম ছিলতে থাকে। ডলি আপু মরিচ পুড়ে আনে। তারপর কাঁচা আমের ভর্তা খেয়ে চোখ লাল করে খালের পাড় চলে যায় সবাই। হৈ হুল্লোর করে নতুন জোয়ারের পানিতে গোসল করে। কী আনন্দমুখর ছিলো সে দিনগুলো। জাবির আর ভাবতে পারে না।

লাইনে দাঁড়ানো আবুল, রতন, হেনা, রুখসানার হাড্ডিসার মুখগুলো মনে পড়ে যায়। রতন কী চমৎকার ফরোয়ার্ড খেলতো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কে বলবে ওর গায়ে এত শক্তি ছিলো।

www.amarboi.org

সারামাঠ একা চষে বেড়াতো। জাবির আর রতন যদি একদলে পড়তো, তবে আর মাঝ মাঠের পর ওদের সীমানায় বল আসতো না কখনো। কেরি কেটে দুজনে হালি হালি গোল দিয়ে তবে বাড়ি ফিরতো। ছি খেলায় হেনার কী দম। সারা বাগান ঘুরে আসলেও ওর দম শেষ হতো না। ও যখন দৌড়াতো তখন ওর লম্বা চুলের বেণী বাতাসে বৈঠার মতো ভাসতো। সে হেনা ছোট্ট একটা বোল নিয়ে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে কটা রিলিফের চালের জন্য। রোদের তাপে ওর মলিন মুখখানা আরো মলিন হয়ে গেছে। জাবির ওদের দিকে আর তাকাতে পারছে না।
আনন্দের স্মৃতিচারণে ছেদ পড়ে ফাহিমের ধাক্কায়।
জাবির চল চেয়ারম্যান চাচাকে বলি মহিলাদের জন্য আলাদা একটা লাইন করার জন্য। পুরুষ মানুষের ধাক্কায় ওরা রিলিফ নিতে পারছে না।

জাবির মনে মনে এটাই ভাবছিলো। জাবির আর ফাহিম দুজনে চেয়ারম্যান চাচার কাছে গিয়ে ওদের প্রস্তাবটা পেশ করলো। চাচা প্রস্তাবটা মেনে নিলেন। কিন্তু তার সেক্রেটারি বুঝাতে চাইলো এতে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। চেয়ারম্যান চাচা হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলেন। ধনছে ক্ষেতের বিছার মতো তার লম্বা গোফটা মূতুর্তের মধ্যে ছোট হয়ে আসলো মুখের উপর।
মহিলারা অল্প সময়ের মধ্যেই আলাদা লাইনে দাঁড়িয়ে গেলো। জাবির আর ফাহিম স্লিপ পেপারগুলো বুঝে নিতে লাগলো। দশ মিনিটের মধ্যেই হেনা চাল নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো। হেনার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে জাবির বললো–
সকাল থেকে কিছু খাসনি বোধ হয়?

হেনা মাথা ঝাঁকালো। আর মাথাটা নিচু করে বাম হাতের উল্টা পিঠে চোখ দুটো মুছে নিলো সে। জাবির আর এক মূহুর্তও ওখানে দাঁড়ালো না।.দৌড়ে চলে আসলো গুদাম ঘরে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুই প্যাকেট বিস্কুট গুঁজে দিলো হেনার হাতে। এই বিস্কুটগুলো ডেনমার্ক সরকার সাহায্য হিসেবে পাঠিয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে। গতকালই চেয়ারম্যান চাচা বিস্কুটের কার্টুনগুলো বুঝে পেয়েছেন। হেনা বিদায় নিলে জাবির আবার মন দিলো তার কাজে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই রিলিফ বিতরণের কাজ শেষ হলে জাবির আর ফাহিম চেয়ারম্যান চাচার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেলা ছোটালো বাড়ির পথে।

www.amarboi.org

পাঁচ

জাবিরের দিকে মা এখন অন্যভাবে তাকায়। তার ছোট্টো ছেলেটাকে এখন অনেক বড়ো মনে হয় । বারো বছরের জাবিরকে এখন আঠারো বছরের যুবক মনে হয়। যে যখন ডাক দেয়, তার সাথেই চলে যায় জাবির। সাধ্যের চেয়ে বেশি উপকার করতে চেষ্টা করে। কারো গরু কি ছাগল ভেসে গেলো। কার ঘরে খাবার নেই। কার খাবার পানি ফুরিয়ে গেছে– সব কিছুর খোঁজ নেবে জাবির। হেনাদের কোনো ভাই নেই বলে তাদের প্রতিদিন এক কলসি খাবার পানি এনে দেয় জাবির। সেই সাথে টুকটাক বাজারও করে দেয় সে। নার্গিসের মা গতকাল তাদের লাল রাতাটাকে দাবড় দিয়েছিলো। বোলের উপর গরম ভাত ঢালতেই রাতাটা ভাতে ঠোকর মারে। দাবড় খেয়ে রাতাটা ঘুরে দৌড় দেয়। ছোট্ট চালাটাকে উঠান মনে করে ভুল করেছে রাতাটা। টাল সামলাতে না পেরে পড়লো পানিতে। স্রোতের টানে সেটা ভেসে যেতে লাগলো দক্ষিণ দিকে। নার্গিসের মা জাবির জাবির বলে চেচাচ্ছে।

জাবির বাবা আমার রাতাটা উদ্ধার কর।

জাবির সবেমাত্র ভাত খেতে বসেছে। দুনলাও খেতে পারেনি এখনো। একঢোক পানি খেয়েই ভেলায় চড়লো। সে লগিতে ভর দিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। স্রোতের অনুকূলে রাতাটার কাছে পৌছতে বেশি দেরি হলো না তার। জাবিরকে দেখে রাতাটার চোখ চকচক করছে। রাতাটার ডানা দুটো ভিজে একাকার। কী অসহায় রাতাটা এখন। অথচ এই রাতাটাই ধলপহরে মোয়াজ্জিন হয়ে যায়। ককর কক কক ক..ক... ডাকে সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। ফারহানার ঘুম ভেঙে যায় রাতাটার ডাক শুনে। ওর ঘুম খুবই পাতলা। সে জাবিরকে ডাকতে থাকে–

ভাইয়া ওঠ। ওই শোন নার্গিসের রাতাটা তোকে ডাকছে। নামাজ পড়তে যাবি না।

জাবির জেগেই ওর ছোট্টো বেণীতে টান দেয়।

এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জাগালি কেন? তোর জন্য একটু ভালোভাবে ঘুমাতেও পারবো না।

ফারহানা ভ্যা ভ্যা করে কাঁদতে থাকে। ভোরে কান্নার আওয়াজ বেশি শোনা যায়। জাবির আর কান্নার আওয়াজ বাড়াতে চায় না। বোনকে কাছে টেনে নেয়। আদর করে। চুলগুলোতে হাত বুলিয়ে দেয়।

চুলমণি আর তোকে টান দেবো না।

ফারহানার কান্না আরো বেড়ে যায়।

এবার ছোটো বোনকে আর ক্ষ্যাপায় না জাবির। ওর চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে–

আপুমণি আর কেঁদো না। তোকে দর্জির দোকান থেকে পুতুলের কাপড় আর আলতা এনে দেবো। কাঁচা তেতুল আর কলার থোড় এনে দেবো।

সত্যি দিবি?

www.amarboi.org

জাবির মাথা দোলায়।
তাহলে তিন সত্যি বল।
সত্যি, সত্যি, সত্যি।
ভাইয়া তুই খু-উ-ব ভালো, বলে ফারহানা জাবিরের গলা জাপটে ধরে ।
এরপর জাবির চলে যায় মসজিদে।

মোরগটাকে নিয়ে ফেরার পথে বাধে বিপত্তি। স্রোতের প্রতিকূলে বেশি দূর আগানো যাচ্ছে না। লগি মেরে একহাত আগালে লগি তুলে আবার ভর দিতে দুহাত পিছনে চলে যেতে হয়। পাকা বাঁশের লগিটা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যায়। জাবির অনেকক্ষণ এভাবে চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না। এখন ফিরে আসতে হলে অনুকূলেই যেতে হবে। ভেলাটাকে যতদূর সম্ভব পুব দিকে নিয়ে যেতে হবে। এতে করে মফিজদের পাড়া হয়ে আসতে হবে। ওরা যদি আক্রমণ করে বসে– একটা ভয় জাবিরের মনে। কী আর করবে। বড়োজোর দুটি লাঠির বাড়ি...। জাবির মানষিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। স্রোতের অনুকূলে থাকায় দশ মিনিটের মধ্যেই সে পৌঁছে যায় মফিজদের পাড়ায়। সব পাড়ার অবস্থা একই রকম। মফিজদের বড়ো পেয়ারাগাছটা পাতা শূন্য দাঁড়িয়ে আছে। পেয়ারাগুলো কেমন ফ্যাকাশে। পানি পেলে আর পেয়ারাগাছ জিন্দা থাকে না। মনে হচ্ছে শত শত টেনিস বল গাছে ঝুলে আছে। কিংবা এটা টেনিস বলের গাছ। মফিজের ভেলাটা গাছের সাথে বাঁধা। সে গাছে বসে পেয়ারা খাচ্ছে। জাবিরের সাথে মফিজের ঝগড়া থাকলেও জাবিরের মায়ের সাথে মফিজের মায়ের বেশ খাতির। দুজনে এক সময় মক্তবে পড়তো। তাদের বান্ধবীভাব এখনো আছে। মফিজের

www.amarboi.org

মা মাঝে মধ্যেই পেয়ারা নিয়ে যেতো জাবিরদের বাড়িতে। ফারহানা পেয়ারা বেশ পছন্দ করে।
মফিজের পিঠ দেখতে পাচ্ছে জাবির। গাধাটা একবার ঘুরলেই জাবিরকে দেখতে পাবে।
'ও আবার টেনিস বল ছুঁড়ে মারবে নাতো আমার দিকে'
ভাবছে জাবির।
সাথে সাথে ক্যাচ ধরার মানষিক প্রস্তুতি নেয়।
ইশ, ঝগড়াটা যদি মিটে যেতো!
মফিজ পুব পাশের ডাল থেকে পশ্চিম পাশের ডালে আসার সময় জাবিরকে দেখতে পেলো। জাবিরের দিকে অপলক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সে। জাবিরও তাকিয়ে থাকলো কতোক্ষণ। কেউ কোনো কথা বলছে না। মফিজই কথা বললো প্রথম।
আরে দোস্ত তুই, এদিকে।
মফিজের সম্ভোধন দেখে জাবির থ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ।
মা বললো গাছটা যেহেতু মরেই যাচ্ছে, তাই কিছু পেয়ারা ফারহানার জন্য পাঠিয়ে দিতে। এই ধর একটা খেয়ে দেখ। পেয়ারা এখনো খুব মিষ্টি।
বলেই মফিজ একটা পেয়ারা ছুঁড়ে দিলো জাবিরের দিকে।
জাবির ক্যাচ ধরলো। কিন্তু এটা কি মফিজের ফাঁদ না আন্তরিকতা তা জাবির এখন পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।
কি রে! চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? খেয়ে দেখ আমার কথা সত্যি কি না।
জাবির খাবে কি না ভাবছে।
এই দুর্গত অবস্থায় শত্রুতা জিন্দা রেখে লাভ নেই। তার চাইতে বন্ধুতা গড়ায় সবারই লাভ হবে।
জাবির পেয়ারায় কামড় দিলো। খুবই মিষ্টি পেয়ারা। এই গাছের পেয়ারা জাবির অনেক খেয়েছে। এটাই বোধহয় শেষ খাওয়া। বন্যা শেষ হলেও গাছটা মরা দেহ নিয়ে হয়তো কিছুদিন দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর চুলায় জ্বলবে তার ডালপালা আর নিচের লম্বা ছেওটি হয়তো আসবাবপত্রের কাজে লাগবে।
মফিজ নেমে আসলো গাছ থেকে। তার ভেলাটা চালিয়ে চলে আসলো জাবিরের কাছে। জাবিরের ভেলাটার সাথে তার ভেলাটা লাগিয়ে দিলো। মফিজ নেমে আসলো জাবিরের ভেলায়। এসে কোলাকুলি করলো ওর সাথে।
দোস্ত চল আমরা ওয়াদা করি, আর কখনো শত্রুতা করবো না।
মফিজের কথায় জাবিরের চোখে পানি এসে যায়। জাবির ভাবতেই পারছে না দুরন্ত মফিজ এত ভালো কি করে হলো? হয়তো পরিস্থিতি এভাবেই সবাইকে বদলে দেয়। বদলে দেয় জীবনের চালচিত্র।
মার সাথে দেখা করবি চল। তারপর ফারহানার জন্য পেয়ারা নিয়ে আমিও যাবো তোর সাথে।
মফিজ জাবিরের ভেলার নিচে দৃষ্টি দিয়ে বললো–
তোর ভেলায় এই রাতাটা কার?
জাবির খুলে বললো রাতা প্রসঙ্গ। তারপর মফিজের মায়ের সাথে দেখা করলো। ফারহানা অসুস্থ শুনে মফিজের মা খুব দু:খ করলো। শিমের বীচি ভাজছিলেন মফিজের মা। জাবিরের কোচর ভর্তি করে শিমের বীচিভাজা দিলেন তিনি। এরপর মফিজ আর জাবির ভেলা ছোটালো জাবিরদের বাড়ির দিকে।

www.amarboi.org

ছয়

ফারহানা শুয়ে আছে বিছানায়। পাকা পেয়ারাগুলোর দিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছে সে। অন্য সময় হলে হৈচৈ শুরু করে দিতো। ওর শুকনো ঠোঁট দুটো নড়ছে। মা একটা পাকা পেয়ারা কেটে ওর মুখে দিলেন। একটুকরো খেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ফারহানা। খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে- আর খেতে ইচ্ছে করছে না মা।

জাবির কদিন ফারহানার দিকে ভালো করে তাকাতে পারেনি। বেড়িবাঁধেই তার বেশিরভাগ সময় পার হয়ে যায়। এখন ফারহানার দিকে তাকিয়ে ওর নিজেকেই নিজে অপরাধী মনে করছে। আদরের বোন ফারহানা, তার এ কি অবস্থা। জাবির ফারহানার একটি হাত তুলে নিয়ে আঙুলগুলো টেনে দিতে লাগলো। মফিজ দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। জাবির মফিজের দিকে তাকালো। তাকে এখন বেশ ভালো লাগছে। তাকে এখন বেশ সুবোধ সুবোধ লাগছে জাবিরের কাছে। জাবিরের মা লতিফা বানু মফিজের মায়ের খোঁজ-খবর নিয়ে তাকে এক টুকরো আখ খেতে দিলেন। জাবির আর মফিজ সমতল টিনের চালাটার দক্ষিণ পাশে মোড়া পেতে বসে আখ খাচ্ছিলো আর ছোবড়াগুলো ভাসিয়ে দিচ্ছিলো বানের স্রোতে।

হঠাৎ দূর থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। মফিজ বললো–

জাবির শুনতো, ফাহিমদের পাড়া থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে না?

জাবির কান খাড়া করলো। পানির উপর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেলো ফাহিমদের পাড়ায়। সবুজ গাছগাছালি পানির উপর ভাসছে। মনে হয় পানির উপর সবুজের রেখা টেনে দিয়েছে কোনো শিল্পী। শুধু তাল সুপারির গাছগুলো বীরের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পানির সাথে তার প্রতিযোগিতা। 'আমাকে হারাতে পারবি না তুই' এমন একটা ভাব। নুহ নবির সময় কি তাল সুপারির গাছেরা এমনি প্রতিযোগিতা করেছিলো? মনে হয়, না। তাহলে মানুষ না হোক অন্তত বাবুই পাখি বাসা বেঁধে থাকতে পারতো তাল সুপারির ডালে। কিন্তু নুহ নবির কিস্তিতে যারা উঠেছিলো তারাই কেবল বাঁচতে পেরেছে। সে পশু হোক কিংবা পাখি বা মানুষ। এমন একটা কিস্তি কি পাবে মানুষ? জাবির ভাবে। নুহ নবিতো এখন আর নেই। মানুষকে সাবধান করার জন্য নবিও নেই। মাওলানা স্যার ধর্ম ক্লাসে বলেছিলেন–

এখন তোমরাই নবি, তোমরাই রাসুল। মানুষকে সাবধান করার দায়িত্বটা তোমাদের সবার। আমরা নিজেরা যদি ভালোভাবে চলি, মানুষের উপকার করি তাহলে নবির দায়িত্বই পালন করা হয়। নবিরা কিন্তু আল্লাহর খলিফা। জাবির আগে বুঝতো যারা জামা কাপড় তৈরি করে তারাই খলিফা।

একদিন স্যার প্রশ্ন করেছিলেন–

জাবির বলোতো ইসলামের প্রথম খলিফা কে?

জাবির বলেছিলো–

স্যার হযরত আবু বকর। এরপর জাবির প্রশ্ন করলো–

স্যার আবু বকরের কি দর্জির দোকান ছিলো?

মাওলানা স্যার তার প্রশ্ন শুনে হেসেছিলেন।

খলিফা মানে প্রতিনিধি, অ্যামবাসেডর বা রাষ্ট্রদূত। যেমন ধরো বাংলাদেশের কোনো একজন রাষ্ট্রদূত আমেরিকা গেলেন। সেখানে তিনি কি করবেন? বাংলাদেশ সরকারের হয়ে কাজ করবেন না?

জাবির হ্যা সূচক মাথা নাড়লো।

www.amarboi.org

তেমনি মানুষও অ্যামবাসেডর বা দূত; আরবিতে বলে খলিফা আর বাংলায় প্রতিনিধি।
একঅর্থে আমরা সবাই আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়ে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, আমাদের উচিৎ সে দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা। তাহলেই খলিফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করা হবে। নচেৎ আমাদের জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর কাছে। আমরা শুধু নামাজ রোজাকেই এবাদত মনে করি; আসলে কিন্তু তা নয়। মানুষের উপকার করাটাও এবাদত। একটা ক্ষুধার্ত পশুকে আহার করানোও এবাদত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আর ন্যায়ের পক্ষে কথা বলাও এবাদত। মানুষের বিপদে আপদে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো বড়ো সোয়াবের কাজ আর নেই।
কিরে কি ভাবছিস! মফিজের ধাক্কায় জাবির সম্বিৎ ফিরে পায়। জাবির সদ্য ঘুম থেকে জেগে ওঠা শিশুর মতো মফিজের দিকে তাকায়।
মফিজ বললো–
কান্নাটা বোধহয় ফাহিমদের বাড়ি থেকেই আসছে।
জাবিরের বুকের ভিতরটায় ধক করে উঠলো। তারপর কতোক্ষণ উদাসভাবে চেয়ে রইলো ফাহিমদের বাড়ির দিকে। এরপর বললো–
হতে পারে। দাদু খুব অসুস্থ। পরশু আমি গিয়েছিলাম ফাহিমদের বাড়ি। দাদুর সাথে কথা বলে এসেছি। আমাকে দেখে দাদু কী যে খুশি হয়েছেন। হাত ধরে বলেছিলেন–
আরে জাবির ভায়া না। তোর কথা সব ফাহিমের কাছ থেকে জানতে পারি। তোরা দুর্গত মানুষের সেবার জন্য রিলিফ ক্যাম্পে কাজ করিস, এটাও আমার অজানা নয়। টুনটুনি বুড়ির জ্বর কমেছে? জানতে চান দাদু।
জাবির না সূচক মাথা নাড়ায়।
দাদু ফারহানাকে আদর করে টুনটুনি বুড়ি ডাকেন। দাদুর শরীরটা বেশ শক্তই ছিলো বলা যায়। হাটের দিন ফেরার পথে দাদু জাবিরদের বাড়ি হয়ে আসতেন। ফারহানার জন্য এটা সেটা নিয়ে আসতেন। সাদা সাদা কদমা, মুড়ুলি, আর সন্দেশ পেয়ে ফারহানা মহা খুশি হতো। দাদু ওকে কোলে তুলে বলতেন–
টুনটুনি বুড়ি, আমিতো তোকে কতো কিছুই দিয়েছি। তুই আমাকে কি দিবি?
ফারহানা তার ছোট্ট বেণী দুলিয়ে বলতো–
দাদু বলো তুমি কি নিতে চাও?
আমি তোর চুলের ক্লিপ নিতে চাই।
ফারহানা খিলখিল করে হেসে বলতো–
এ দাদু পাগল! মেয়েদের জিনিস পরতে চায়।
দাদু নাছোড়বান্দা। চুলের ক্লিপ পরবেনই।
ফারহানাও চুলের ক্লিপ খুলে দাদুর দাড়ির মধ্যে লাগিয়ে দিতো। এরপর তার কী যে হাসি। উঠোন জুড়ে তার সে হাসি শোনার জন্য অবাক হয়ে হাঁস-মুরগীগুলো দাঁড়িয়ে যেতো।
সেই দাদু এখন নেই! ভাবতেই জাবিরের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো।
দুফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ফারহানার দিকে একপলক তাকিয়ে জাবির আর মফিজ ভেলা ভাসিয়ে দিলো ফাহিমদের বাড়ির দিকে।

www.amarboi.org

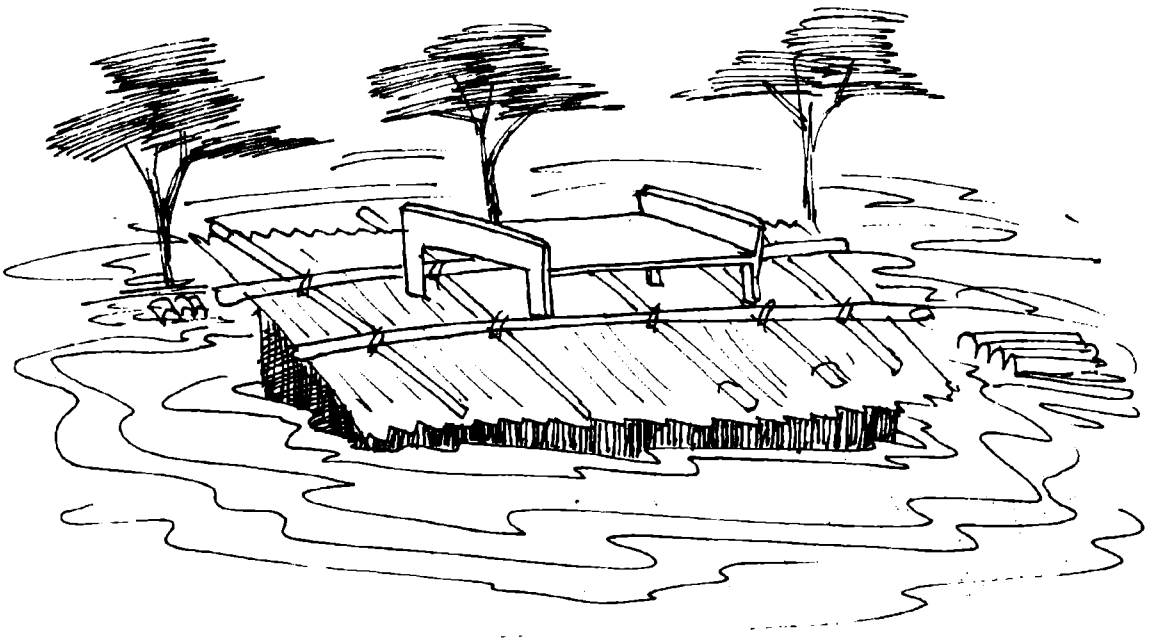

কাচারি ঘরের চালার উপর একটা খাটিয়া। খাটিয়াটা উত্তর দক্ষিণমুখি। চারপাশে নৌকা আর ভেলা বাঁধা আছে ঘরের সাথে। এখন কাচারি ঘরটাকে একটা টার্মিনালের মতো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যাত্রী বা মালপত্র বোঝাই কিংবা খালাস করার জন্য যানবাহনের ভিড়। লঞ্চ টার্মিনালে যেমনি শত শত নৌ-যান বাঁধা থাকে, তেমনি ফাহিমদের কাচারি ঘরটাতে বাঁধা আছে সারি সারি নৌকা আর ভেলা। চারপাশ থেকে মানুষজন কেউ নৌকায় কেউবা ভেলায় করে আসছে ফাহিমদের বাড়ির দিকে। ফাহিমের দাদা মুন্সি আব্দুল আলিম একসময় খুব নাম করা শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন চরশোলাদি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। পুরো এলাকায় তার নাম ডাক। বর্তমানে যারা এই হাইমচর উপজেলাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা অনেকেই আলিম মাস্টারের ছাত্র ছিলেন একসময়। যারা হাইমচর বাজারের বড়ো ব্যবসায়ী তারাও তার ছাত্র ছিলেন। অনেকে স্কুলের পাঠ চুকিয়ে ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামে পাড়ি জমায় উচ্চ শিক্ষার জন্য। শিক্ষা জীবন শেষ করে অনেকেই নানা পেশায় ছড়িয়ে আছে সারাদেশে। কিন্তু নাড়ির বন্ধন! তাতো কখনো ছিন্ন করার মতো নয়। যারা ঈদ মৌসুমে গ্রামের বাড়িতে আসে– তারা নামাজ শেষে সবার আগে কোলাকুলি করে আলিম মাস্টারের সাথে। জাবিরের বাবাও আলিম মাস্টারের ছাত্র ছিলেন। জাবির দেখেছে দাদুর প্রতি তার বাবার কী ভালবাসা। দাদু ফারহানাকে না দেখে থাকতে পারতেন না। তাই তিনি মাঝে মধ্যেই চলে আসতেন জাবিরদের বাড়িতে। এসে জোরে ডাক দিতেন 'টুনটুনি বুড়ি' বলে। বাবা তখন নিজেই মোড়া পেতে দিতেন গাছের তলায়। নিজেই মুড়ি, মোয়া, পাকা কলা, এটা সেটা নিয়ে যেতেন তার প্রিয় শিক্ষকের জন্য। জাবির চাইলেও তাকে পরিবেশন করতে দিতেন না বাবা। প্রিয় শিক্ষককে নিজ হাতে আপ্যায়ন করিয়ে তৃপ্ত হতেন। এরপর পানির গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন পাশে। প্রিয় শিক্ষকের প্রতি বাবার এ মমতা মাখা ভক্তি দেখে জাবিরের মন ভরে যেতো। বাবা কখনই দাদুর সামনে বসতেন না। দাঁড়িয়ে থাকতেন। দাদু বসতে বললেও বসতেন না। বাবা বাড়ি না থাকলে জাবির

www.amarboi.org

নাস্তা পরিবেশনের দায়িত্বটা পেতো। বাবার মতো সেও পানির গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকতো। কিন্তু দাদু কিছুতেই জাবিরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিতেন না। ধমক দিয়ে বলতেন–

তুইতো আর আমার ছাত্র না, আমার বন্ধু। বন্ধুর পাশে কি বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?

এরপর দাদু পাশের মোড়াটাকে আরেকটু কাছে টেনে বসতে বলতেন জাবিরকে। ফারহানা দাদুর কোলে বসে মিটিমিটি হাসতো তখন।

সেই দাদু নেই! জাবির ভাবতে পারে না কিছুতেই। জাবির লগি মারছে ঠিকই কিন্তু তার ভাবনা ডানা মেলছে স্মৃতিতে।

একসময় জাবিরদের ভেলা এসে ভিড়লো ফাহিমদের কাচারি ঘরটায়। ঘরের চালাগুলো সমতল। চালা থেকে পানি এক হাত নিচে। টিনের ঢেউগুলো মানুষের পায়ের ভারে সমান হয়ে গেছে অনেক জায়গায়। ফাহিম জাবিরকে দেখামাত্রই তাকে জড়িয়ে ধরে আরো জোরে কাঁদতে লাগলো। পাশে দাঁড়িয়ে মফিজও কাঁদছে। তাদের কান্না এবার সবার ভিতর সঞ্চারিত হলো। যারা এতক্ষণ ধরে কেঁদে কিছুটা শান্ত ছিলো, তারাও আবার কান্না শুরু করে দিয়েছে। জাবির ফাহিমকে ধরে খাটিয়ার কাছে গেলো। উত্তরপ্রান্ত থেকে কেউ একজন চাদরটি সরিয়ে দিতেই দাদুর মিষ্টি হাসিটি ছড়িয়ে পড়লো। কী জীবন্ত সে হাসি! একজন মৃত মানুষ এভাবে হাসতে পারে! নাকি তিনি অন্য একটি জগতে এসে এভাবে হাসছেন। যেখানে বন্যা নেই, মানুষে মানুষে হানাহানি নেই, মারামারি কাটাকাটি নেই, জমির আল নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ নেই, রিলিফের মাল নিয়ে কাড়াকাড়ি নেই। সেই জগতের অনাবিল শান্তি দেখে দাদু হয়তো হাসছেন। সাদা দাড়িগুলো পরিপাটি করে সাজানো। ভরাট কপাল। শুধু চোখ দুটো বন্ধ। কে বলবে এই দাদু এখন মৃত! জাবির কতোক্ষণ মোহাবিষ্টের মতো তাকিয়ে থেকে দাদু বলে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে দাদুর লাশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দাদুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো কতোক্ষণ। সেই সাথে ফাহিমও কাঁদছে। জাবির ও ফাহিমকে দাদু কখনো দু মায়ের সন্তান মনে করতেন না। মনে করতেন ওরা দুটি ভাই। প্রাণের চেয়ে প্রিয় দুটি আদরের নাতি। দাদু সময় পেলে দুজনকে নিয়ে পড়াতে বসে যেতেন। কী চমৎকার ছিলো দাদুর পড়ানোর ঢঙ। জাবির মাঝে মধ্যেই বলতো–

দাদু আমার জন্ম কেন আগে হলো না। আমি যদি আপনার ছাত্র হতে পারতাম। দাদু তখন মিষ্টি করে হাসতেন। কিছু না বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতেন। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা বলতেন।

ফাহিমের বাবা দুজনকে তুলে ওদের চোখ মুছে দিলেন। বুকে আগলে ধরে দক্ষিণ দিকে সরিয়ে নিয়ে আসলেন। এরপর মুখে হাসি টেনে বললেন–

যাও বাবা, দাদুকে কবর দিতে হবে না? তোমরা দুজনে জাবিরের বাবার সাথে বেড়িবাঁধে যাও। ওখানে আমরা কবর খোড়ার জন্য জায়গা ঠিক করে এসেছি।

কান্না ধোঁয়া মুখটাকে জাবির একটু উঁচু করলো। সবার দিকে একবার তাকিয়ে তারপর আবার চোখটাকে স্থির করলো খাটিয়ায় রাখা সাদা চাদরে আবৃত দাদুর লাশটির দিকে। মানুষের সব দাপট, আদর আর ভালোবাসা বুঝি এভাবেই সাদা চাদরে ঢাকা পড়ে যায়? জাবির ভাবে, একদিন কি তাকেও এভাবেই সাদা কাপড়ে ঢেকে দেবে সবাই?

ফাহিম জাবিরের কাঁধে হাত রাখলো।

ওরা শোককে শক্তিতে পরিণত করার প্রত্যয় মনে নিয়ে যার যার ভেলায় চড়লো।

একটা ডিঙি নৌকায় জাবিরের বাবা আরো কয়েকজন লোক নিয়ে ওঠলেন। জাবির, ফাহিম আর মফিজ–ওরা তিনজন ভেলায় চড়ে লগি মেরে ছুটলো বেড়িবাঁধের দিকে।

www.amarboi.org

সাত

দাদু মারা গেলেন আজ সাতদিন। কিভাবে যে সাতটা দিন কেটে গেলো আঙুলের কর গুনে জাবির তার হিসাব মিলাতে পারে না। সবকিছু কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে। মনের গহীনে কী যেন একটা বেদনা চাপা আর্তনাদের মতো বাজে। এই অবারিত সবুজ মাঠ, মেঘনায় রঙ বেরঙের নৌকা, ইলিশের মৌসুমে জেলেদের উল্লাস, ক্ষেত জুড়ে লাল মরিচের ঝিলিক, সারি সারি সুপারি বাগান, আমের মুকুলের গন্ধ, বেতফল আর কাঁচা আম পাড়ার জন্য কতো প্রতিযোগিতা, দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে বাড়ির পিছনে সাতগুদ্দা খেলা, বারবার গোসলের নামে বুবি বুবি খেলা, বসন্তের ঝিরি ঝিরি বাতাসে বৌচি খেলা, চৈত্র মাসে গলিয়া হারকানির নানা বাধা নিষেধ ভাঙার দুরন্তপনা– সব কিছু জাবিরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দাদুর প্রাণখোলা হাসিটা মনে পড়ে। দাদির মেহদি রাঙা সোনালি চুল, পান খাওয়া মুখখানা বারবার মনে পড়ে। নামাজের বিছানায় টেনে, সামনে বসিয়ে রেখে দোয়া করার কথা মনে পড়ে।

স্মৃতিকে পাশে রেখে জাবির চোখ বুলায় বর্তমান সময়ের দিকে। তার আঁকা ছবিটার দিকে নিবিষ্ট মনে চেয়ে থাকার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মায়ের ডাক, পায়ে বিড়ালের কামড়, ধানের বস্তাগুলো মাচায় তোলা, সাই সাই করে ঘরে পানি ঢোকা, বাবার আহাজারি, খাটের উপর খাটের বিছানা, দাঁড়াশ সাপটির করুণ আকুতি, সামান্য রিলিফের জন্য খরতাপে মানুষের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা, রিলিফের মাল নিয়ে সেক্রেটারি আর মেম্বারদের কারসাজি, ফাহিমের সাথে কর্মব্যস্ত সময়, ফারহানার ফুটফুটে চেহারায় রোগাক্লিষ্টতার ছাপ– এসব কিছু জাবিরকে ব্যথিত করে।
দুফোঁটা অশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কোলের উপর। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। দুটো গালে নোনা পানির স্পষ্ট রেখা। এসব কিছু দেখে তার শিল্পী মন আনমনা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ভাবে; বন্যার এই করুণ দৃশ্য সে আঁকতে বসবে। জয়নুল যেমন দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছিলেন, জাবিরও তেমনি বন্যার ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়ে যাবে। সারাদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়বে। রঙতুলি নিয়ে বসেছিলোও কয়েকদিন। মন সায় দেয়নি। আঁকতে পারেনি কিছুই। যে মূহুর্তে মানুষ মৃত্যুর সাথে লড়ছে, সে মূহুর্তে রঙতুলি হাতে তার সাজে না। লগিটাই হাতে মানায়। ভেলাটাই সাথে বেশি মানায়। জাবির নিজের মনেই প্রশ্ন করে, জয়নুল পেরেছিলেন কিভাবে? চোখের সামনে মরতে থাকা মানুষগুলোর ছবি আঁকতে পেরেছিলেন কিভাবে? তখন কি পারতেন না শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে? তিনি কি তবে নিজেই বিখ্যাত হবার জন্য ছবি এঁকেছিলেন। জাবির নিজের মনকে শুধরে নেয়। সে এসব কি ভাবছে। এত বড়ো একজন শিল্পীর ব্যাপারে...। নিজেই নিজের মনে উত্তর খুঁজে নেয়। জয়নুলের সে সব ছবি ছাপা হবার পরেইতো বিশ্ববাসীর নজর ফিরে এসেছিলো এই বাংলার মানুষের প্রতি। সেই ছবি দেখেইতো অনেকে এগিয়ে এসেছিলো, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো। হয়তো জয়নুল বড়ো শিল্পী বলে সব দেখেও তার মনোবল দিয়ে নিজের মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন, ছবি আঁকাই তার কাজ। ছবি দিয়েই মানুষের মনকে জাগানো যায়।

www.amarboi.org

তাদের হৃদয়ে মানুষের প্রতি ভালবাসার বীজ বুয়ে দেয়া যায়। মমতা আর ভালবাসার বীজ বুনে শান্তি আর সৌহার্দ সবার প্রতি বিলিয়ে দেয়া যায়। জাবির ভাবে, বড়ো হলে কি সে জয়নুলের মতো বড়ো শিল্পী হতে পারবে?

ফারহানার ডাকে জাবিরের চিন্তারাজ্য বেদখল হয়ে যায়। বা হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছে চলে যায় আদরের বোন ফারহানার কাছে। তার শীর্ণ হাত দুটো দুহাতে চেপে ধরে। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কতোক্ষণ। ঠোঁট দুটো সাদা সাদা। চোখের নিচে কালি পড়ে আছে। জাবির কপালে হাত দিয়ে দেখে, এখনো গায়ে জ্বর আছে। ফারহানা দাদুর কথা জিজ্ঞেস করে।

ভাইয়া দাদুকে তোমরা কোথায় কবর দিয়েছ?

জাবির বেড়িবাঁধের দিকে আঙুল দেখায়। প্রসঙ্গ ঘোরাতে চেষ্টা করে। ফারহানা কিভাবে যেন জেনে গেছে দাদু মারা গেছেন। দাদুর মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর থেকে কেঁদেছে কয়েক দিন। দাদুর কথা মনে হলেই আনমনা হয়ে কাঁদে ফারহানা। ফারহানা আবার প্রশ্ন করে–

ভাইয়া, মৃত্যুর সময় দাদু আমার কথা জানতে চায়নি?

হ্যা, তোকে অনেক দোয়া দিয়ে গেছে।

ফারহানা, আমরা তোকে নানু বাড়ি নিয়ে যাবো। কয়েক দিনের মধ্যেই হয়তো আমরা রওনা হবো। নানু তোর জন্য পিঠা বানাবে। পাতারপিঠা। তুই কুরকুর করে খেতে পারবি।

কে বলেছে ভাইয়া? তুই জানলি কিভাবে নানু পাতারপিঠা বানাবে?

জাবির মনে মনে খুশি হলো, মোক্ষম অস্ত্রটাই চালান করতে পেরেছে বলে। পাতারপিঠা ফারহানার খুব প্রিয়। জাবির ফারহানার অগোছালো চুলগুলো আলতো করে টানতে টানতে বললো–

কেন, মা তোকে কিছু বলেনি?

কৈ নাতো, আমাকেতো কিছুই বলেনি।

নানু বাড়ির কথাটা বানিয়ে বলেছে জাবির। এখন কোন প্রসঙ্গে যাওয়া যায় তাই ভাবছে মনে মনে। দাদুর প্রসঙ্গ সরিয়ে নানু বাড়ির প্রসঙ্গে আসাতে এখন জাবির আর সামনের দিকে আগাতে পারছে না। স্যার বলেছিলেন একটা মিথ্যা দশটা মিথ্যার জন্ম দেয়।

এই সময় জাবির বাবার ডাক শুনতে পেলো পশ্চিম দিকের কলাগাছের ঝাড়ের ওপাশ থেকে। এটাকে আর কলাগাছের ঝাড় বলা যায় না। কলাপাতাগুলোকে পানির মধ্যে ভাসমান একটা ফুলের মতো মনে হয়। ফারহানা এটাকে বলে কলাপাতাফুল। বাবা নৌকা নিয়ে এর মধ্যেই বাড়ির উঠোনে চলে এসেছেন। রান্না ঘরের পাশে যে নারিকেলগাছটা আছে তার সাথে নৌকাটা বেশ লম্বা করে বাঁধলেন বাবা। এরপর তিনি আরেকটি ভর দিয়ে এঘরের চালায় চলে আসলেন। আর একটা লম্বা দড়ি দিয়ে আটকে দিলেন এঘরের চালার সাথে। বাবার এই বুদ্ধিটা জাবিরের বেশ মনে ধরেছে। ঘরের খুঁটির সাথে নৌকা বাঁধলে খুঁটি আলগা হয়ে যেতে পারে। সে জন্যেই নারকেলগাছের সাথে বাঁধা। আবার নৌকাটিকে কাছে পেতে হলে সুতা ধরে টান দিলেই আরেক মাথা চলে আসবে ঘরের কাছে। এতে করে যে কোনো সময় নৌকাটিকে ব্যবহার করা যাবে।

নৌকা বাঁধা হয়ে গেলে বাবা মাকে ডাক দিলেন–

www.amarboi.org

জাবিরের মা আগামী পরশু তোমাদেরকে জাবিরের নানাবাড়ি রেখে আসবো। তোমাদের নিতে জাবিরের বড়ো মামা আসবেন। আমি বড়ো একটা পানসি ভাড়া করে এসেছি।

মা বললেন–

আমি বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবো না। আর যদি যেতে চাও তবে বেড়িবাঁধে যেতে পারি।

জাবিরের নানাবাড়ির সাথে জাবিরের মায়ের একটা দূরত্ব আছে। নানা মারা যাওয়ার পর দূরত্বটা আরো বেড়েছে। জাবিরের বাবা সেটা জানতেন। তিনি নিজেও ব্যাপারটা মিটমাট করার চেষ্টা করে সফল হতে পারেননি। সে জন্য মা না করার পর এ নিয়ে বাবা আর কথা বাড়ালেন না। চালায় উঠে হাত মুখ ধুয়ে ফারহানার কাছে এসে বসলেন।

এখন কেমন লাগছে মা।

আগের চেয়ে একটু ভালো লাগছে বাবা। বাবা, নানু নাকি আমার জন্য পাতারপিঠা বানিয়ে রেখেছেন?

কে বলেছে তোমাকে?

ভাইয়া বলেছে।

বাবা জাবিরের দিকে তাকালেন। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, হ্যা।

বাবা ফারহানাকে তুলে নিজের বুকের সাথে ঠেস দিয়ে বসালেন। এরপর জাবিরের মাকে ডাক দিয়ে খাবার দিতে বললেন। চিঙড়ি আর চালতা দিয়ে ঝোল রান্না করেছেন মা। জাবিরের বাবা এটা খুব পছন্দ করেন। বাবা কটা ভাত ফারহানার মুখে তুলে দিলেন। বার্লি আর সুজি ছাড়া ফারহানার পেটে অন্য কিছু ঢোকে না কয়েক দিন। অনেক দিন পর চালতার ঝোল দিয়ে কটা ভাত খেতে পেরেছে ফারহানা। নানুবাড়ির কথা শুনে ফারহানার শুকনো ঠোঁটে কিছুটা আনন্দের আভা ফুটে

www.amarboi.org

উঠেছে। হয়তো তার মনে নানা আনন্দের ডালপালা বিস্তার করছে। বাবা কাছে থাকায় জাবির ফারহানাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না। পরে জিজ্ঞেস করে নেবে। ফারহানা দুএকটা ভাত মুখে নেবার ছলে আঁড়ালে ভাইয়ার সাথে ভাব বিনিময় করে নিচ্ছে। বাবা মায়ের সাথে বন্যা, দোকানপাট, বাজারের অবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গে টুকটাক কথা বলছেন। জাবিরের মনে তখন অন্য চিন্তা। ফাহিম, মফিজ, রতন– ওদেরকে নিয়ে বন্যা কবলিত মানুষের সেবায় যে কাজটি তারা করে আসছে, তার কি হবে? চেয়ারম্যান চাচাতো মেম্বার আর সেক্রেটারির সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না। হয়তো তার ক্ষমতা আছে, অনেক লোকবল আর ভক্তের দল আছে। কিন্তু সৎ মানুষের সৎ সঙ্গী কজন আছে, সেটাই প্রশ্ন।

জাবির একদিন চেয়ারম্যান চাচাকে প্রশ্ন করেছিলেন–

চাচা সবাই আপনাকে এত ভালবাসে? আপনার কাছে এসে সবাই কী না প্রশংসা করে...

চেয়ারম্যান চাচা জাবিরকে থামিয়ে দিলেন।

এরপর বললেন–

সমস্যাটাতো এখানেই। সবাই যদি দোষটা আমার সামনে এসে বলতো, আর গুণটা বলতো পিছনে, তবে আমি নিজেকে শুধরে নিতে পারতাম। সব হারামির দল। সামনে গুণগান গায় সুবিধা নেবার জন্য, আর পিছনে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায় দুর্বল করার জন্য। এজন্য মাঝে মধ্যে চেয়ারম্যানিটাই ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে।

জাবির বললো–

না না, চাচা, এটা আপনি করবেন না। তাহলে অসহায় দরিদ্র মানুষগুলো আর কারো কাছে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারবে না।

জাবিরের চোখে সেই অসহায় মানুষের ছবি ভেসে ওঠে। জাবিররা না থাকলে ওরা হয়তো এক কেজি চালের জন্য না খেয়ে মারা যেত। মেম্বাররা সেটাই চায়। তাহলে পত্রিকায় আর টিভিতে হাইমচরের বন্যার খবর, বন্যা কবলিত মানুষের মৃত্যুর খবর ফলাও করে প্রচার করা যেতো। এতে মেম্বারদের লাভ হতো বেশি। চারদিক থেকে দেশী-বিদেশী, সরকারি-বেসরকারি সাহায্য আর ত্রাণসামগ্রী আসতো। মেম্বারদের পকেট বেশি করে ভারি হতো। জাবির আড়ালে থেকে মেম্বারদের শলাপরামর্শগুলো শুনে তাই বুঝেছে। তাদের এ ধরনের ধূর্তামি দেখে জাবির নীরবে চোখের পানি ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

তবে চেয়ারম্যান চাচাকে তাদের কুপরামর্শের কথা জাবির বলেছিলো একদিন। চাচা সবই জানতেন। কিন্তু সবাই যখন অসৎ হয়ে পড়ে তখন একজন সৎ মানুষ আর কি করতে পারে?

জাবিরের মন সায় দিচ্ছে না নিজের স্বার্থের কথা ভেবে নানাবাড়ি চলে যেতে। গেলে শুধু নিজেদেরই লাভ হবে, পরিবারের লাভ হবে, কিন্তু জীবনভর একটা অপরাধবোধে জর্জরিত থাকতে হবে। মানুষের দুর্যোগ আর দুর্ভোগ দেখে নিজের জান নিয়ে জাবির সরে পড়েছে। জাবির তা কখনো করতে পারে না।

কিন্তু বাবার সামনে 'যাবো না' এই কথাটি বলার মতো সাহস রাখে না জাবির।

বাবা খাওয়া শেষ করে জাবিরকে বললেন–

www.amarboi.org

বাবা জাবির, তুমি সারাদিন ভেলা নিয়ে কোথায় টো টো করে ঘুরে বেড়াও। আমাকে যে একটু সাহায্য করবে সে ফুরসৎ তোমার হয় না। তোমার অসুস্থ বোনটির একটু সেবা করবে সে সময়ও তোমার হয় না। এদিকে তোমার মা সারাদিন এ চালার উপর অসুস্থ ফারহানাকে নিয়ে আছে।

জাবির বাবার অনুযোগের জবাবে কিছুই বলছে না। সুবোধ বালকের মতো নিচের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাবা আবার বললেন–

তুমি যে রিলিফ ক্যাম্পে পড়ে থাকো, মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করো, তা আমি শুনতে পাই। সবাই তোমার প্রশংসা করে আমার কাছে। এটা খুব ভালো কাজ। তবে নিজের পরিবারের সেবাও তো করতে হবে, তাই না?

জাবির মাথা ঝাঁকায়।

বাবা একটু থেমে আবার বলেন–

আগামীকাল আমরা সকাল সকাল রওনা হবো। তুমি তোমার মাকে সাহায্য করো গোছগাছ করার কাজে।

বাবা আর কোনো কথা বললেন না। মায়ের হাত থেকে একখিলি পান নিয়ে চিবোতে চিবোতে নৌকার দড়ি খুললেন। একটুপর ডিঙির বৈঠা পানি কেটে কেটে চলে গেলো সামনের দিকে। আর তার এঁকে যাওয়া রেখার দিকে চেয়ে আছে জাবিরের দুটি কঁচিচোখ।

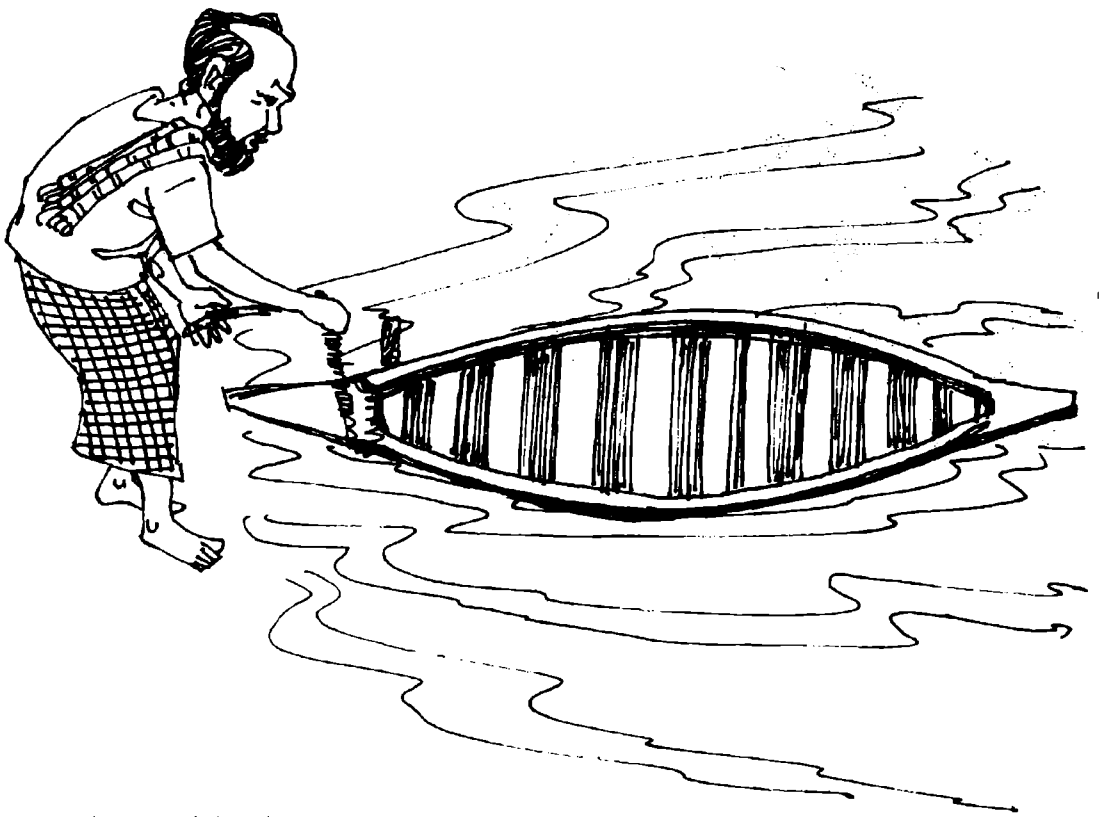

www.amarboi.org

আট

পানি বাড়ছে। বাড়ছে রোগ বালাই। খাদ্যের সংকট বাড়ছে। যদিও কদিন ধরে বৃষ্টি নেই। তবে ভাদ্র মাসের প্রখর রোদে মস্তক যেন টগবগ করে ফুটছে। টিনের চালা কামারশালার মতো গরম হয়ে ওঠছে। অনেকে টিনের উপর কলাপাতা ছড়িয়ে তার উপর হোগলা বিছিয়ে দিয়েছে। সেই সাথে মাথার উপর দিয়েছে কলাপাতার চান্দিনা। হালকা দখিনা বাতাস থাকাতে কোনো মতে শরীরটা ঠান্ডা রয়েছে।

মেঘনার ভাঙনের খবর জাবির বাবার কাছ থেকেই জানতে পারে। এভাবে ভাঙতে থাকলে দুসপ্তাহের মধ্যেই জাবিরদের বসতভিটা, দোকানপাটও ভেঙে নিয়ে যাবে মেঘনা। স্রোতের টানে পানির নিচ থেকে মাটি সরে গিয়ে আস্তে আস্তে মাঠগুলো বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ক্ষেতের উপর পানি থাকায় ভাঙনটা টের পাওয়া যায় না। কিন্তু নদীতে সারি সারি সুপারি আর কলাগাছগুলো যখন পাল তোলা নৌকার মতোন ভাটির পানে ছুটে যায়, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না কিছুই।
করাতিরা বড়ো বড়ো গাছগুলো কেটে, ডালপালা ছেঁটে গাছের গুঁড়িগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যায় বেড়িবাঁধের দিকে। কামলারা ঘরের চালাগুলো খুলে নৌকায় তুলে নেয় কোনো মতে। সবার গন্তব্য একটা নিরাপদ আশ্রয়। ভাটার সময় পানি কিছুটা কমে যায়। তখন গাছ কাটা আর ঘরের চালা নিয়ে কামলাদের ব্যস্ততা বেড়ে যায় কয়েকগুণ সেই সাথে বাড়ির বউ ঝিয়েরাও নিজেদের বাসন কোসন সরানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাবা এক কথার মানুষ। জাবির জানে, মা না করলেও শেষ পর্যন্ত নানাবাড়ি যাবেন। বাবা শেষে হয়তো বলবেন, চাঁদপুর গেলে ফারহানাকে ভালো ডাক্তার দেখানো সম্ভব হবে। ফারহানা ভালো হয়ে যাবে। মা তখন আর না করতে পারবেন না। ফারহানার কথা ভাবলে জাবিরেরও চলে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ফাহিম, রতন, হেনা, রুখসানা, মফিজ– ওদের কথা চিন্তা করলে আর মন সায় দেয় না চলে যেতে।
জাবির মায়ের সাথে গোছগাছ করছে। বাবা রাতে মাকে ফারহানার কথা বলেছেন। ডাক্তারের কথা বলেছেন। মা আর না করতে পারেননি। তাই সকাল থেকেই গোছগাছ করতে লেগে পড়েছেন। কিন্তু মার যে যেতে মন চায় না জাবির তা ভালো করেই জানে। মাকে বেশি ভালবাসে বলে জাবির মায়ের সব কিছুই বুঝতে পারে।
মা তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না?
জাবিরের দিকে চোখ তুলে চাইলেন মা। দরদর করে ঘাম ঝরছে শরীর থেকে। মা জাবিরকে কাছে টেনে নিলেন। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে দিলেন। তারপর কপালে চুমু খেয়ে বললেন–
তোর খারাপ লাগছে না বাবা? তুই তোর বন্ধুদের ছেড়ে চলে যাবি। তুই তোর এই সুন্দর বাড়িটা ছেড়ে চলে যাবি? এটা তোর কাছে কষ্টকর ব্যাপার না?
জাবির মাথা ঝাঁকায়।
মা আবার বলেন–

www.amarboi.org

এই বাড়িটা আমার দেহের একটা অংশ হয়ে গেছে। চলে গেলে মনে হবে, কী যেন ফেলে গেছি। সে জন্যেইতো আমি বাড়ি ছেড়ে কোথাও দুদিন থাকতে পারি না। মা কান্না শুরু করে দিয়েছেন।
ফারহানা একপাশে শুয়েছিলো। মায়ের কান্না শুনে তার ঘুম ভেঙে গেছে। ঘামে তার শরীর চুবচুবে অবস্থা।
জাবির বললো–
মা দেখো, ফারহানার মনে হয় জ্বর বেড়েছে।
মা আঁচলে চোখ মুছে ফারহানার কাছে চলে এলেন। ওর মাথাটা একটু উঁচু করে ধরে শরীরটা মুছে দিলেন।
জাবির মরিচের বস্তার মুখটা বেঁধে বললো–
মা, আলাচালের কলসিটা কি খালি করবো?
তুই রাখ, আমি আসছি।
জাবির তার কাপড়-চোপড়, ফারহানার কাপড়-চোপড় গোছাতে লাগলো। এরপর বই খাতা গোছাতে গোছাতে তার আঁকা ছবিটার দিকে নজর পড়লো। বাঁশের ফ্রেমে বাঁধাই করা ছবিটা।
জাবির নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করে।
জাবির তুই কি করে আঁকলি এই সুন্দর ছবিটা?
জাবির মুচকি হাসে। ছবিটার দিকে নিবিষ্ট মনে চেয়ে থাকে কতোক্ষণ। তারপর কাপড়ের ব্যাগের উপর ছবিটা রেখে দেয় সে।
ফারহানাকে আবার শুইয়ে রেখে মা তার কাজে মন দেন।
মা আজ রান্নার কাজটা একটু আগেই শেষ করলেন।
আমি দুপুরের খাবার একটু আগে খেয়ে সবার সাথে দেখা করতে বের হবো মা।
বললো জাবির।

www.amarboi.org

এই ঝাঁজালো রোদে তুই কোথায় বের হবি। আজকে রোদের তাপও কিন্তু বেশি। তার চেয়ে সূর্যটা একটু হেলে এলে বের হ।
মায়ের কথায় জাবিরের মুখখানা মলিন হয়ে এলো। চারপাশের পরিস্থিতির অবনতি দেখে এই প্রথম মা জাবিরকে বাইরে বের হতে নিষেধ করলেন।
জাবিরের মুখের দিকে তাকিয়ে মা আবার বললেন–
ঠিক আছে, তোকে আগেই খাইয়ে দিচ্ছি। এবার একটু হাস বাবা। তোর বেজার মুখখানা দেখলে আমার কষ্ট হয়।
জাবির খেয়ে দেয়ে একটা কলসি নিয়ে বের হলো। হেনার মায়ের কাছ থেকেও একটা কলসি চেয়ে নিলো। হেনার মায়ের কাছে জাবির বলতে পারলো না–
চাচি আমরা কাল চলে যাচ্ছি। এটাই তোমাদের জন্য এনে দেয়া শেষ খাবার পানি।

জাবির ভেলা ছোটালো ফাহিমদের বাড়ির দিকে। আগে লগিতে ভর দিলে কচি কচি ধানের চারার সাথে লগির স্পর্শ পাওয়া যেতো। এখন আর সে স্পর্শটা পাওয়া যায় না। তার বদলে পাওয়া যায় খড়কুটোর স্পর্শ। কদিন আগে জাবির আর ফাহিম শালুক খুঁজতে গিয়ে ধান ক্ষেতের অবস্থা ডুব দিয়ে দেখেছে। সব ধান লোদের ভেতর মিশে গেছে। এবার কি খেয়ে যে বাঁচবে এই নীলকমলের মানুষ, তা আল্লাহই ভালো জানেন।
ফাহিমদের বাড়ি এসে জাবির ফাহিমের মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলো। ফাহিমদের বাড়ি আসলে দাদুর সাথেই জাবিরের সময় কাটতো বেশি। ফাহিমের মা খুব কম কথা বলেন। শুধু খোঁজ-খবর নেয়া ছাড়া ফাহিমের মায়ের সাথে তেমন কোনো কথাই হয় না জাবিরের। মা কেমন আছেন, ফারহানা কেমন আছে– এটুকু জিজ্ঞেস করেই ফাহিমের মা ব্যস্ত হয়ে পড়েন নাস্তার আঞ্জামে।
ফাহিমের বাবা এক ঘরের সাথে অন্য ঘরের যোগাযোগের জন্য বাঁশের সাঁকো বানিয়ে দিয়েছেন। বাড়ির সবাই সাঁকো দিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে আসা যাওয়া করে। ফাহিমদের বড়ো সংসার। চাচারা সবাই একসাথে থাকে। ওরা সবাই মিলে যে কোনো কাজ খুব দ্রুতই করে ফেলতে পারে। জাবির ফাহিমের অন্য চাচিদের কাছ থেকেও বিদায় নিলো।
তারপর দুবন্ধু ভেলা ভাসালো বেড়িবাঁধের দিকে।

ফাহিমদের সুপারিগাছের আগাগুলো কেমন হলুদ হয়ে গেছে। এই গাছগুলো বোধ হয় আর বাঁচবে না। জাবির আর ফাহিম গল্প করতে করতে লগি মারছে। দুজনের ভেলা দুটোই আগের ভেলার চাইতে বেশ মজবুত। কাটা কলাগাছ পানিতে বেশি দিন টেকে না। জাবিরদের ভেলার কলাগাছগুলো নরম হয়ে গেলে ওরা নতুন করে ভেলা বানাবার কথা ভাবে। গেলো সপ্তাহে দুবন্ধু মোটা মোটা দশটি কলাগাছ কাটে জাবিরদের ঝাড় থেকে। গাছগুলো কাটতে ওদের অনেক কষ্ট হয়েছে। নিচের অংশটা বেশি পাওয়ার জন্য বারবার ডুব দিয়ে কলাগাছ কেটেছে ওরা। একবার ডুব দিয়ে কতোটুকু কেটে আবার দম নিতে হয়েছে। এভাবে অদলবদল করে দশটি কলাগাছ কেটেছে ওরা। তারপর বাঁশঝাড় থেকে মোটা জিংলা কেটে ছোটো ছোটো ডালপালাগুলো ছেটে নেয়। এরপর কলাগাছগুলো পাশাপাশি রেখে একটার সাথে আরেকটা গেঁথে দিয়েছে। এ সময় মফিজ হঠাৎ এদিকে আসায় ওদেরকে সাহায্য করতে পেরেছে।

নতুন ভেলা দুটো সাঁই সাঁই করে এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। আগের চাইতে কম শক্তি খরচ

www.amarboi.org

করে এখন ওরা অনেক বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারে।
বেড়িবাঁধে মানুষের ভিড় আগের চাইতে অনেক বেড়ে গেছে। এই রাস্তাটাই এখন মানুষের আশ্রয়স্থল। জাবির শুনেছে চরভৈরবী বাজারের দিকে নাকি নদী ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এখনকার মতো সমান গতিতে ভাঙলে হয়তো বেড়িবাঁধ ছুটে যেতে পারে। তাহলে সাঁই সাঁই করে পানি বাঁধের ভিতরে ঢুকে পড়বে। বাঁধের ভিতরের মানুষের আর কষ্টের সীমা থাকবে না তখন। তারা তখন কোথায় আশ্রয় নেবে জাবির আর ভেবে পায় না। বাঁধের বাইরের মানুষেরা তবুও বাঁধের ভিতরে যে আত্মীয়স্বজন আছে তাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু বাঁধ ছুটে গেলে ভিতরের লোকদের কে আশ্রয় দেবে? তাদেরতো যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই।
আল্লাহ বাঁধটাকে টিকিয়ে রাখুন। জাবিরের প্রার্থনা এটাই।

জাবির চেয়ারম্যান চাচা, মেম্বার আর সেক্রেটারির কাছ থেকে বিদায় নিলো। মেম্বারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় একজন মেম্বার পাছে বলেছে–
আপদটা বিদায় হয়েছে।
জাবিরের কানে কথাটা ঢুকেছে। কিন্তু সে আর পিছনে ফিরে তাকায়নি।
চাচা বললেন–
তোমার আব্বার সাথে গতকাল আমার কথা হয়েছে। তোমার আব্বা বলেছে তোমার মা নাকি যেতে চাচ্ছে না?
জাবির মাথা ঝাঁকায়।
চাচা আবার বলেন–
আমার মনে হয় এ মূহুর্তে তোমাদের নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়াই ভালো।
জাবির আর এ বিষয়ে কোনো কথা বলেনি। শুধু বলেছে–
চাচা, আমি চলে গেলেও ফাহিম, মফিজ, রতন ওদেরকে আপনি আমার কাজগুলো করতে দেবেন। মেম্বাররা হয়তো ওদেরকে পাত্তা দিতে চাইবে না।
চাচা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। জাবিরকে কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন–
তুমি কিভাবে ভাবলে বাবা, আমি ওদেরকে বিদায় করে দেবো? ওদের সবাইকেতো আমি চিনি। ওরা ওদের মতো করে কাজ করবে। কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবে। তবে যাওয়ার আগে তুমি তোমার বন্ধুদের মধ্য থেকে একজনকে দলনেতা বানিয়ে দিয়ে যেয়ো।
জাবির মাথা ঝাঁকিয়ে বলে–
ফাহিমই আমার পরে দলনেতা। ফাহিম আপনার সাথে যোগাযোগ রাখবে প্রতিদিন।
চেয়ারম্যান চাচার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাবির আর ফাহিম বেড়িবাঁধের মানুষদের দেখতে বের হলো। মানুষের জন্য হাঁটাই যাচ্ছে না। পরিচিত অপরিচিত কতো মানুষ। গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী, শিশুদের কোলাহল– কোন কিছুর কমতি নেই। কমতি শুধু আশ্রয়ের, কমতি শুধু খাদ্যের।
জাবির সূর্যের দিকে তাকালো। জাবির আর ফাহিম হাত ধরাধরি করে হেঁটেছে এতক্ষণ।
জাবির বললো–
ফাহিম চল, সূর্য ডোবার আর বেশি বাঁকি নেই। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে।
ফাহিম ভাবে, রাত পোহালেই চলে যাবে জাবির। তাই ওর সঙ্গটা আরো বেশি করে আদায় করে নিতে হবে।

www.amarboi.org

আরেকটু সামনে চল। মোড় পর্যন্ত যাই। তারপর না হয় ফিরে আসবো। আর রাত হলে ক্ষতি কি? চাঁদনি রাত। আকাশও পরিস্কার। চাঁদনি রাতে ভেলায় চড়ে আমরা মাঠ জুড়ে ঘুরবো। আজ সারাবেলা না হয় ভেলায় কাটালাম। এরপরতো শুধু বিশ্রাম আর বিশ্রাম। সেইসাথে নানাবাড়ি নানা স্বাদের খানাপিনায় ব্যস্ত থাকা।

নারে দোস্ত। আমার একদম যেতে ইচ্ছে করছে না। আর খানাপিনার কথা বলছিস। খেতে যখন বসবো তখন আমার মুখে এক লোকমাও ঢুকবে না। রিলিফ ক্যাম্পের হাড্ডিসার মানুষের না খাওয়া মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠবে তখন।

জাবিরের কথায় তার হৃদয়ের করুণ আকুতি ঝরে পড়ে। ফাহিম জানে ওর বন্ধুর মনের কথা। তাই তাকে আর খুঁচিয়ে দুঃখ বাড়াতে চাইছে না।

দুজনে ভেলায় চড়ে বসলো। আজ সন্ধ্যার পর পরই চাঁদের আলোয় গোটা মাঠ ঝলমলিয়ে ওঠেছে। চাঁদের আলো পানিতে ঝলমল করছে। দূরের গ্রামগুলো চাঁদের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে দুএকটা ডিঙি নৌকা জাবিরদের পাশ দিয়ে চলে যায়। ছোট ছোট কোসা নৌকায় বড়শি দিয়ে মাছ ধরছে কিছু বেদে জেলে। বর্ষার সময় ওদেরকে দেখা যায়। আবার বর্ষা শেষে ওরা চলে যাবে বেদেপল্লীতে। দিনেরবেলা বেড়িবাঁধে ওদেরকে কেঁচো খুঁড়তে দেখেছে জাবির। জাবিরের হাসি পেলো ওদের এই জীবিকা নির্বাহ দেখে। যে সময় হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দি সে সময় ওরা বন্যার পানিতে মাছ ধরছে। আয় রোজগার বাড়াচ্ছে। অনেকের বাড়ির পুকুর বন্যায় ভেসে যাওয়ার ফলে পুকুরের মাছগুলো এখন বিলে। তাই ওরা মাছও পাচ্ছে প্রচুর।

জাবির ফাহিমকে বলে–

ফাহিম চল, আমরা এখানে বসে কতোক্ষণ গল্প করি। দেখ বেড়িবাঁধটাতে মনে হয় জোনাক পোকার মেলা বসেছে। হারিকেন, কুপি আর মোমের আলোগুলোকে ছোট ছোট জোনাক পোকার আলোর মতো মনে হচ্ছে।

তোরা কালকে কখন রওনা হবি?

বাবা বলেছেন, বড় মামা আসলেই আমরা রওনা হবো। বড়ো মামা নাকি ফজরের আজানের সময় লঞ্চ থেকে নামবেন। তারপর বাবা আর বড়ো মামা পানসি নিয়ে আসবেন বাড়িতে। বাজার থেকে বাড়িতে আসতে ধর সাতটা বাজবে। এরপর নৌকায় মালপত্র বোঝাই করতে দুতিন ঘন্টা সময় লাগবে। আমার মনে হয় দশটার মধ্যেই আমরা রওনা হবো।

জাবির আর ফাহিম আরো কতোক্ষণ গল্প করে কাটালো। স্কুলের গল্প, বন্ধুদের গল্প, অতীত-বর্তমান আর ভবিষ্যতের গল্প। এরপর ফাহিম বললো–

জাবির চল। রাত হয়ে গেছে। আমরা এবার উঠতে পারি। তোরতো একটু বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে। কালকেতো নদীতেই দিন চলে যাবে।

হ্যা চল, বলে জাবির উঠে দাঁড়ালো।

দুজনে ভেলার লগিতে ভর দিতে লাগলো। নীরবে চললো দুজনে কিছুক্ষণ। তারপর দুজনের দুটি ভেলা চলে গেলো দুদিকে। পানিতে লগির দুটি আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিশে গেলো বাতাসে।

www.amarboi.org

নয়

ঘুম থেকে উঠেই মা জাবিরের ভেলাটি নিয়ে বের হলেন সবার সাথে দেখা করার জন্য। বাবার বাড়ি যাবার আগে সবার সাথে শেষ কুশল বিনিময় করতে চান তিনি। কবে আসবেন তাতো নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিয়ের পর জাবিরের মা তিন দিনের বেশি কোথাও থাকেননি। মা ভাবতেও পারেননি তিনি তার স্বামীর সংসারটিকে এভাবে আপন করে নিতে পারবেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে এই সংসারে এসেছেন তিনি। কিভাবে যে এতগুলো বছর কেটে গেলো মা কিছুই টের পেলেন না। এই বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনি আপন করে নিয়েছেন। পাড়া প্রতিবেশীর সাথে মায়ের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। মা কখনোই কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হননি। কারো উপকার করা ছাড়া অপকার করার কথা মা চিন্তাও করেননি কখনো।

বাবা কাল রাতে দোকানে থেকে গিয়েছিলেন। দোকানের গদিতে একটা মাচা বানিয়ে কর্মচারি আতাউর থাকে। কাল রাতে বাবা আতাউরের সাথে মাচাটাতে কোনো মতে ঘুমিয়েছেন। মামাকে সাথে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসার জন্য তার এ ব্যবস্থা।

তাই সকাল সকাল মাকে বের হতে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। মা বের হবার সময় জাবিরকে বলেছেন, ফারহানার দিকে খেয়াল রাখতে। রাতে ফারহানা ঘুমাতে পারেনি। জ্বর বেড়েছে অনেক। মা অনেক রাত পর্যন্ত ফারহানার মাথায় পানি ঢেলেছেন।

বাবা বাড়িতে আসার আগেই মা সবার সাথে দেখা করে এসেছেন। মা আসার একটু পর বাবা বড়ো একটা পানসি নিয়ে ঢুকলেন বাড়ির উঠোনে। পানসির ছইয়ের ভেতর থেকে বড়ো মামা বের হয়ে

www.amarboi.org

আসলেন। অনেকদিন পর বড়ো মামা জাবিরদের বাড়ি এসেছেন। সকালের সূর্য পুব দিকে ফাহিমদের গ্রামের গাছপালা ছাড়িয়ে একটু উপরে উঠেছে মাত্র। সূর্যের আলো জাবিরদের উঠোনের পানিগুলোকে ঝলমল করে তুলেছে। বাবা রান্না ঘরের পাশের নারকেলগাছটির সাথে পানসিটি বেঁধে আরেক মাথা নিয়ে আসলেন এঘরের চালায়।

জাবির মামাকে অনেক দিন পর দেখছে। মামার দাড়িগুলো অর্ধেকের বেশি পেকে গেছে। মাথার চুলও পেকেছে অনেক। চোখে ভারি ল্যান্সের চশমা। তবে মামা চাঁদপুর শহরে থাকেন বলে তার স্বাস্থ্য ও চেহারায় একটা বড়োলোক বড়োলোক ভাব ফুটে আছে। বড়ো মামা জাবিরকে খুব আদর করতেন। আগে বড়ো মামা বছরে অন্তত একবার আসতেন জাবিরদের বাড়িতে। জাবির আর ফারহানার জন্য কাপড়-চোপড় আর বিভিন্ন খেলনা নিয়ে আসতেন। জাবিরের বয়স তখন পাঁচ কি ছয় হবে আর ফারহানা তখন কেবল বসতে শিখেছে। জাবিরের সব মনে আছে। তবে ফারহানার মনে রাখার বয়স হয়নি তখনো।

সব গন্ডগোল ছোটো মামাকে নিয়ে। ছোটো মামা মাকে খুব অপমান করেছিলো সেবার। সেজন্যেই মা আর নানাবাড়ি যেতে চান না।

মামা নৌকা থেকে নামলেন। এরপর চালায় উঠে জাবিরের মাকে জড়িয়ে ধরলেন। আদরের বোনকে এতদিন পর কাছে পেয়ে মামার চোখে আনন্দের কান্না। দুভাই বোন জড়াজড়ি করে কাঁদলেন অনেকক্ষণ।

মায়ের অনুযোগের শেষ নেই। যদিও মা আগে বলেছেন, তার ভাই আসলে কথা বলবেন না। এখন দুনিয়ার কথা জুড়ে দিয়েছেন ভাইয়ের সাথে। মামা আসার সময় আম, আনারস, আপেল এটা সেটা নিয়ে এসেছেন।

বাবা মাকে তাড়া দিলেন, নাশতা দেবার জন্য।

মা কথা বলতে বলতে নাশতার আয়োজন করতে লাগলেন। মামা জাবিরের পড়াশোনার খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। ফারহানা মামার কোলে বসে আপেলের একটা টুকরো চিবোতে চেষ্টা করছে। ফারহানার এ অবস্থা দেখে মামা বাবাকে ধমক দিয়ে বললেন–

আকবর তোমার কান্ডজ্ঞান দেখেতো আমি হতবাক! মানুষের এত বিচার-আচার কর। আর মেয়েটার একি হাল! শরীরের হাঁড়গুলো গোনা যায়। ওকে নিয়ে অন্তত চাঁদপুরতো একবার যেতে পারতে। আর বাড়ি ঘরের একি দশা করেছো? এভাবে মানুষ থাকতে পারে?

আমরাতো পত্রিকা পড়ে যতটুকু জানতে পারি। কিন্তু তোমাদের এখানকার অবস্থাতো অনেক ভয়াবহ।

বাবা বললেন–

আমি ফারহানাকে চাঁদপুর নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার বোন আমার কথা শুনলেতো।

মা আর কোন কথা বললেন না।

মামাই আবার বললেন–

তোমরা গোছগাছ শেষ করো। মালপত্র সব নৌকায় তোলার ব্যবস্থা করো। মাঝিদেরকে আমি বলে দিচ্ছি তারাই সব তুলে দেবে।

এক ঘন্টার মধ্যেই সব মালামাল নৌকায় তোলা হয়ে গেছে। যেসব জিনিসপত্র নেয়া সম্ভব নয়

www.amarboi.org

সেগুলো ঘরের চালের এক জায়গায় জড়ো করে উপরে পলিথিন দিয়ে তারপর দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন বাবা।
মা নৌকায় উঠলেন আগে। তারপর মামা ফারহানাকে কোলে করে নৌকায় পা দিলেন। সব গোছগাছ শেষ করে বাবা নৌকায় উঠলেন আর জাবির পা রাখলো তার ভেলায়।
জাবির তার ভেলাটা সাথে করে নিয়ে যেতে চায়। বাবা ওকে একটা ধমক দিলেন। জাবিরের চোখে পানি এসে যায়। মা বললেন–
থাক না, ও যেহেতু ভেলাটা সাথে করে নিয়ে যেতে চাইছে, এটা নৌকার সাথে বেঁধে নিলেই হবে।
মামাও সম্মতি দিলেন। বড়ো মামার কথার উপর বাবা কখনো কথা বলেন না– জাবির এটা ভালো করেই জানে। মামার সম্মতির পর বাবা আর কথা বাড়ালেন না।

জাবির তার ভেলাটা নৌকার সাথে শক্ত করে বাঁধলো। ভেলাটাকে নৌকার সাথে বেঁধে সে নৌকার উপরে উঠে আসলো। পুব দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো সামান্য দূরে ফাহিম, রতন, মফিজসহ জাবিরের বন্ধুরা চার পাঁচটি ভেলায় চড়ে ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। এদিকে নার্গিস, হেনা ও আশপাশের প্রতিবেশীরাও ভেলা ও কোসায় করে এসেছে জাবিরদের বিদায় জানাতে। মা মহিলাদের জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। আঁচলে চোখ মুছে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেন। অল্পক্ষণ পরেই ফাহিমদের ভেলা এসে ভিড়লো জাবিরদের পানসির সাথে। জাবির বন্ধুদের সাথে কোলাকুলি করলো। তাদের বললো–
গরিব অনাহারি মানুষেরা যেন ত্রাণের চাল ঠিক মতো পায়। মফিজ, রতন, ওদেরকে বললো, ফাহিমের কথা মতো চলতে।

নৌকার মাঝিরা তাড়া দেয়।
তাড়াতাড়ি রওনা না হলে বেলা থাকতে পৌঁছানো যাবে না। স্রোতের বেগ অনেক বেশি।
মামা জাবিরের প্রতি তার বন্ধুদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে খুশি হলেন।
নৌকা স্টার্ট নিয়েছে। নৌকার ইঞ্জিন ঝনঝন আওয়াজ তুলে গোটা পানসিটাকে কাঁপিয়ে তুলছে। ফাহিম, রতন, মফিজরা নৌকা ছেড়ে যার যার ভেলায় উঠলো। নৌকাটি বাড়ির আঙ্গিনা পার হয়ে কলাপাতাফুলের পাশ দিয়ে খালের মধ্যে প্রবেশ করেছে। জাবির তাকিয়ে আছে তার বন্ধুদের দিকে। ফাহিমরাও তাকিয়ে আছে নৌকার দিকে। আস্তে আস্তে ফাহিমদের ছবিগুলো ছোটো হতে লাগলো জাবিরের চোখে। এখন শুধু রান্না ঘরের পাশের নারকেলগাছটির আগা দেখা যায়। সব কিছুই অস্পষ্ট হতে থাকলো জাবিরের কাছে। দূরের গ্রামগুলো আরো দূরে সরে যাচ্ছে। জাবির যতোই সামনের দিকে যাচ্ছে ততই দেখতে পাচ্ছে মানুষের দুর্ভোগ আর দুর্দশা। জাবিরদের পানসি নৌকাটি এখন মেঘনার ঢেউ কেটে কেটে চাঁদপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন আর তার ছবির মতো গ্রামটি দেখা যাচ্ছে না। সবুজ গালিচার মতো ধনচে ক্ষেতটি দেখা যাচ্ছে না। কলাপাতাফুলের মতো কলাগাছের ঝাড়টি দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না প্রিয় বন্ধুদের ভেলাগুলো।
একটা স্টিমার উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে ধেয়ে আসছে। মাঝি পানসিটাকে আরেকটু পুব দিকে সরিয়ে আনলো। যাতে ঢেউয়ের আঘাতটি কম লাগে নৌকার ডালিতে। স্টিমারটি পানি কেটে চলে

www.amarboi.org

যাচ্ছে সামনে। তার এঁকে যাওয়া বড়ো বড়ো ঢেউয়ের আঘাত লাগছে জাবিরদের নৌকায়।
জাবির তার আঁকা ছবিটা গলুইয়ের কাছে একটা বস্তার উপর রেখেছিলো। ভাবছিলো পরে সরিয়ে এনে রাখবে ছইয়ের ভিতর। এর মধ্যে তার বন্ধুরা চলে আসাতে জাবির ছবির কথা বেমালুম ভুলে গেছে।
হঠাৎ বড়ো একটা ঢেউ এসে লাগে পানসির ডালিতে। পানসিটা দুলে ওঠে প্রবল বেগে। জাবিরের ছবিটা বস্তার উপর থেকে পড়ে যায় পানিতে। জাবির ছইয়ের ভেতর থেকে দ্রুত বের হয়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ছবিটার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না জাবিরের। তার ছবিটা আস্তে আস্তে মেঘনার পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে।
তলিয়ে যাচ্ছে একটি সুন্দর গ্রাম। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট একটা খাল। খালে কয়েকটি নৌকা। পাল তোলা। ছোট ছেলে-মেয়েরা পানিতে খেলছে। একটি সুন্দর বাড়ি খালটির পুব পাড়ে। দুটি ঘর। সুন্দর সাজানো উঠোন। সামনে একটি ফুলের বাগান। আট বছরের একটি মেয়ে পানি দিচ্ছে ফুল গাছে। উঠোনে হাঁস-মুরগী আদার খাচ্ছে। খোলা আকাশ। সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। এক ঝাঁক পাখি উড়ছে। ...

তলিয়ে গেলো জাবিরের ছবিটি। জাবির আকাশের দিকে তাকালো। একটি ঈগল ডানা মেলে উড়ছে আকাশে। আর তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া দুটি অশ্রুফোঁটা মিশে গেলো মেঘনার ঘোলা

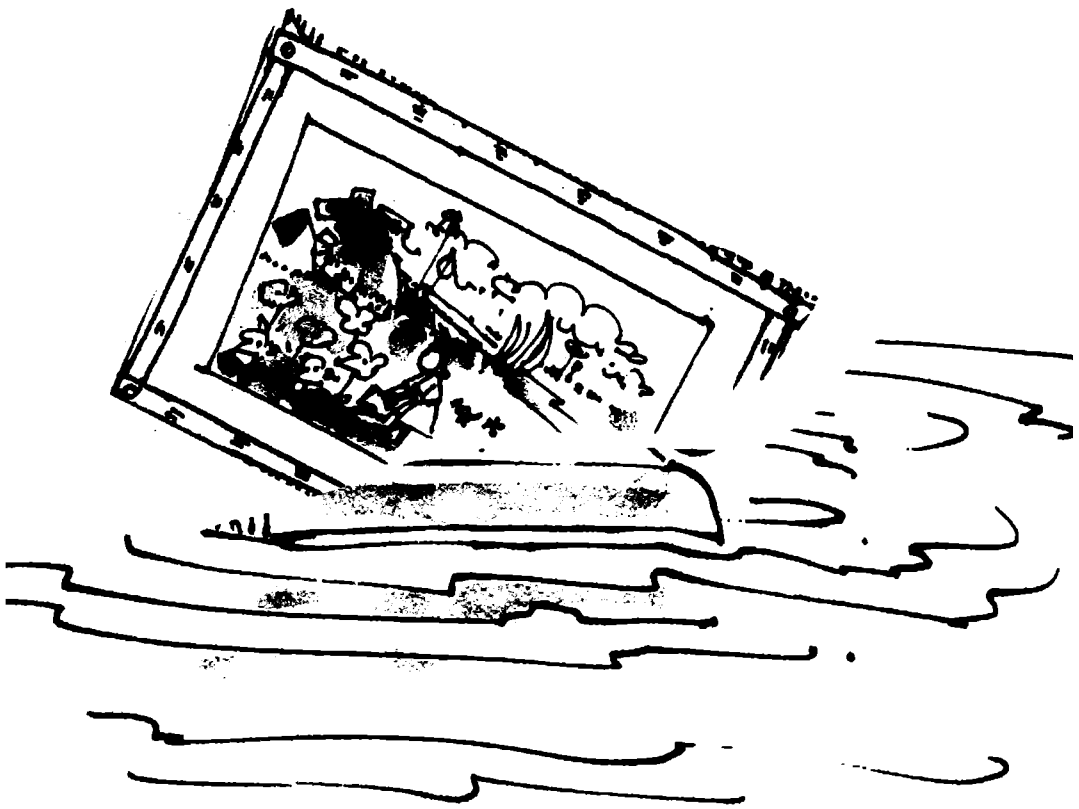

www.amarboi.org

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩।

ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১।

ISBN 984-493-110-X

9789844931107